কলকাতার নিশাচর

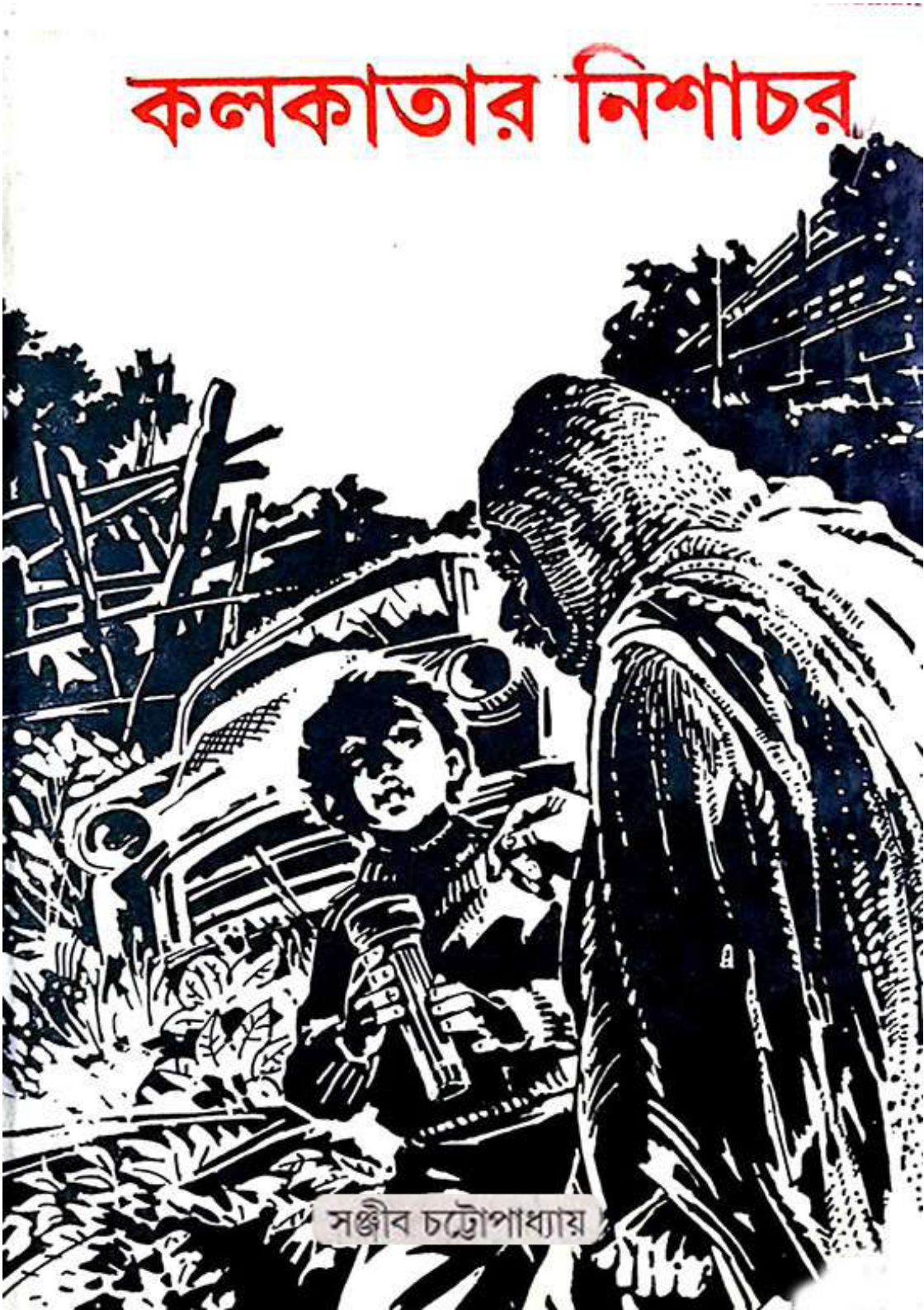

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার নিশাচর

ক্যালিপসো থ্রম্বোফব

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৪

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতার নিশাচর

রাত বারোটা চারপাশ নিশুতি, নিস্তব্ধ। কলকাতায় সহজে মানুষের ঘুম আসে না। ঘুম না এলেও দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সিনেমার শেষ শো ভেঙে মানুষ বাড়ি চলে যায়। গ্যালিফ স্ট্রিটের ট্রাম ডিপো খাঁ-খাঁ করে। মাইলের পর মাইল নির্জন রাস্তায় ট্রাম লাইন গা এলিয়ে শুয়ে থাকে। গঙ্গা থেকে এঁকেবেঁকে মজা যে খালটা বেলগাছিয়া হয়ে, লবণ হ্রদ পেরিয়ে বেলেঘাটার দিকে চলে গেছে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, সেই খালের বুকে কুয়াশার আঁচলের মতো পাতলা ধোঁয়া উঠতে থাকে। মাঝে মাঝে গপ গপ করে আগুন জ্বলে। যেন একটা ড্রাগন দিনের শেষে সব কাজ সেরে আঁকাবাঁকা দেহটিকে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত মেলে একটু রাতের বিশ্রাম নিচ্ছে। এখনও রাগ আছে, তাই নিশ্বাসে আগুন ঠেলে বেরোচ্ছে। খালধারের বটতলায় একটা মোটরগাড়ির বিকল ভাঙা দেহ বহুকাল পড়ে আছে। চারপাশে ফিনকি ফিনকি ঘাস লকলকিয়ে উঠেছে। ওপাশে ভাঙাচোরা লোহা আর কাচের স্তূপ দুটো টিলার মতো পাশাপাশি বসে আছে। যেন দুই প্রহরী, গাড়ির ভাঙা খাচাটাকে পাহারা দিচ্ছে। ওপারে খালের জল ঘেঁষে সার সার ঝুপড়ি, গ্যালারির মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। সারাদিন টিন মিস্ত্রির যে দোকান বড় বেশি শব্দ করে, সেই দোকান ঝাপ টেনে গভীর অন্ধকারে মুখ বুজে পড়ে আছে। কেউ যেন হাত নেড়ে বলে গেছে—চুপ, আর একটুও শব্দ নয়। পশ্চিমে গঙ্গার দিক থেকে আসছে ফোস ফোস বাতাসের নিশ্বাস।

শীতও পড়েছে তেমনি। হাড়কাঁপানো। দাদু ফিসফিস করে বললেন, ‘কানে আর মাথায় ভাল করে মাফলার জড়িয়ে নাও। কীরকম শীত পড়েছে

দেখেছ! রাত যেন হি হি করে কাপছে। হাত-পা গুটিয়ে কেমন সব কোণে কোণে বসে আছে দেখছ!'

মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথা বলছেন। ল্যাম্পপোস্টের চাপা আলো এসে পড়েছে দাদুর মুখে, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। চোখ, নাক আর পাতলা ঠোট দুটো বেরিয়ে আছে। ফরসা চেহারা। কথা বলছেন, মুখ দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে। রাত পাছে চমকে ওঠে তাই বাতাসের সুরে যেন কথা বলছেন।

'কোণে কোণে কারা বসে আছে দাদু?'

'দেখছিস না! রাত জড়ো হয়েছে ঘুপচিতে ঘাপচিতে।'

বহু দূরে রেলইয়ার্ডের ওপারে গোটাকতক কুকুর মড়াকান্না জুড়েছে। অন্ধকারে বটের পাতা চামচিকির ডানার মতো ভুতুড়ে বাতাসে কাঁপছে। মনে হচ্ছে এখুনি গায়ে অন্ধকারের ছিটে লাগবে। কোথাও মনে হয় মালগাড়ি শান্টিং হল। এমন একটা অদ্ভুত শব্দ, যেন মাটির ভেতর থেকে কোনও দৈত্য বড় বড়, ভারী ভারী ঘড়া টেনে বের করছে। কাশীপুরের দিক থেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশানের বয়লারের স্টিম ছাড়ার তীব্র শব্দ ভেসে আসছে থেকে থেকে। এই শব্দটা শুনলেই মনে হয় পৃথিবীর পেট থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

দাদু বললেন, "গলার শেষ বোতামটা পর্যন্ত আটকে দে। খুব হাওয়া ছেড়েছে। তারা পর্যন্ত কাঁপছে।'

'তারা হাওয়ায় কাঁপে নাকি? সে তো অমনি কাঁপে। টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিটল স্টার। গ্রহদের নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো ধার করে, তাই স্থির। বইয়ে পড়েছি। পরীক্ষায় এসেছিল, পাঁচের মধ্যে পাঁচ।'

'মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তক্কো কোরো না।'

‘আপনি বলেছিলেন, সবসময় যুক্তি-তক্কো চালাবে, তবেই তুমি নামকরা ব্যারিস্টার হতে পারবে।’

‘সে এখন নয়, এখন নয়। দিনের বেলায়।’

সামনেই ট্রামলাইনের চারটে লোহার পাত চকচক করছে। আমরা দু’জনে রাস্তার এপার থেকে ওপারে গেলুম। খালের ধারে। ঢালু পাড় নেমে গেছে নীচে জলের দিকে। এক আঁজলা কালো অন্ধকারের ছলছলে চোখ। দাদু সামনে ঝুঁকে পড়ে, সেই মোটরগাড়ির কঙ্কালের ভেতর টর্চের আলো পেললেন। অন্ধকার দু’পাশে সরে গেল। চোখের ভুল কি না জানি না, এক ঝলকের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল, পেছনের আসনে হেলান দিয়ে বসে আছেন একজন পুরুষ একজন মহিলা। শ্বেতপাথরের মূর্তিতে আলো পড়লে যেরকম দেখায় অনেকটা সেইরকম। চোখের মণি দুটো সাদা। যেন কালো ধুয়ে গেছে। এক ঝলকের দেখা। ভয়ে দাদুর একটা হাত চেপে ধরলুম।

আমি যা দেখলুম, দাদুও তাই দেখলেন কি না আমি জানি না। তবে মনে হল তিনিও যেন ভয় পেয়ে গেছেন। টর্চ নিবিয়ে আবার টর্চ জ্বালালেন। কোথায় কী? এবার আর কিছুই নেই, মরচে-ধরা লোহার খাঁচা। পাকানো পাকানো চারটে স্প্রিং। প্রাণহীন সব লোহালক্কড়।

দাদুর হাত ছেড়ে দিলুম। আবার যেন সাহস ফিরে এল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দাদু বললেন, ‘তুমি ছোট আছ, একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখো তো। খাঁজেখোঁজে কিছু আছে কি না?’

নতুন টর্চ, চারটে নতুন ব্যাটারি। দিনের মতো আলো। ভাঙা গাড়ির ভেতরে যত ষড়যন্ত্র, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্টিয়ারিং-এর গোল চাকাটা বেঁকে

সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে। একবার মনে হল, হাত দিয়ে ঘোরালেই টাইম মেশিনে'র মতো সময়টাই ঘুরে যাবে।

দাদু বললেন, 'সামনে, ড্রাইভারের বসার জায়গাটা ভাল করে দেখো। ক্লাচ, ব্রেক, গিয়ার, ঘুপচিমতো হয়ে আছে। ভয় নেই, ভয় নেই, আমি তোমার পেছনেই আছি।'

ভয় নেই বললেই কি আর ভয় চলে যায়। একটু আগে যা দেখেছি, হয়তো চোখের ভুল, তবু ভোলা যায় না। সামনে ঝুঁকে, একটু নিচু হতেই ভয়ে ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। ব্রেকের কাছে একমাথা চুল যেন মাটি ফুঁড়ে উঠছে। এই প্রথম টের পেলুম ভয়ে মানুষের গলা বুজে যায়। ছিলেছেড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠতেই দাদুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। টর্চটা হাত থেকে পড়ে নিবে গেল। আমি বলতে চাইছি, একমাথা চুল, কি, একচুল মাথা। কী যে বলতে চাই নিজেই জানি না। শুধু চুচু করে চলেছি।

'অ্যাঃ, টর্চটা আবার কোথায় পড়ে গেল।' দাদু নিচু হয়ে খুঁজতে লাগলেন। আমি চুচু করছি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী চুচু করছ। কাবাডি খেলছ নাকি?'

বাতাসে ভয় কিছুটা উড়ে যায়। এবার বাক্য ফুটল। ওখানে একমাথা চুল।"

'একমাথা চুল মানে? মাথাভরতি চুল!'

পড়ে আছে পায়ের কাছে। নড়ছে-চড়ছে।'

'চুল আবার নড়ে নাকি? মাথা যদি নাড়ায় তবেই নড়তে পারে। অ্যাঃ, তুমি ভয় পেয়ে গেছ দেখি সরো। কেঁপেকুঁপে একেবারে অস্থির!'

দাদুর হাতের টর্চ থেকে আলোর রেখা বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল সেই জায়গাটায়। নিচু হয়ে ভাল করে দেখলেন। বড়রা ছোটদের মতো অত সহজে ভয় পায় না। আমিও যখন দাদুর মতো বড় হব আমারও খুব সাহস হবে। বাবার চেয়েও সাহসী। মাঝরাতে অন্ধকারে একাই ছাতে উঠে ঘুরে বেড়াতে পারব। মনেই হবে না পিঠে কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

দাদু নিচু হয়ে পাশ থেকে গাছের একটা ভাঙা ডাল তুলে নিলেন। মা আমাকে সঙ্গে পাঠিয়েছেন দাদুকে সামলাবার জন্যে। বলা যায় না ঝোঁকের মাথায় কখন কী করে বসেন!

'ডাল কী হবে দাদু?'

'জিনিসটা কী একবার দেখতে হবে না?'

'ওটা কারু মাথা। হয়তো এই গাড়ির ড্রাইভারের। তলায় শুয়ে শুয়ে গাড়ি মেরামত করছিল, কোনওভাবে চাদিটা হয়তো আটকে গেছে। গাড়িতে চুম্বক থাকে তো?'

'তোমার মাথা?'

দাদু রেগে গেলেন। বড়দের এই দোষ। কথার কোনও ঠিক থাকে না। কথায় কথায় বলেন, ছোটদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর দিতে হয়, ভুল বললে শুধরে দিতে হয়। মেজাজ খারাপ করতে নেই। ধৈর্য চাই, ধৈর্য। বাবা যখন রেগে কান মলে গাধা বলেন, দাদু এইভাবেই সাবধান করেন। আর এখন যে নিজেই রেগে যাচ্ছেন! রোধহয় ভয়ে।

এক হাতে টর্চ, এক হাতে গাছের ডাল। ডাল দিয়ে জিনিসটাকে একবার খোঁচা মারলেন। কান খাড়া করে ছিলুম। ভেবেছিলুম, খোঁচা খেয়ে এখুনি হয়তো

কেউ বলে উঠবে, 'কে রে!' নাঃ, কোনও গলাই শোনা গেল না। রাত নিস্তব্ধ, বাতাসের শব্দ, পাতার খসখস। জলের ধারে ঝিঁঝির শব্দ।

ডালে গেঁথে জিনিসটাকে কায়দা করে তুলে আনলেন, যেন নরমুণ্ডশিকারি। ভাল করে দেখে হো হো করে হাসতে লাগলেন। কীরকম নাটক করার মতো গলায় বলতে লাগলেন, 'বহুত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল নকল চুল। এইবার, এইবার কী হয়? এইবার তুমি যাবে খালের জলে।'

'জিনিসটা কী দাদু?'

'থিয়েটারের নকল চুল।'

'এখানে এল কী করে?"

'মনে হয় রঙমহল থেকে কাকে মুখে করে উড়িয়ে এনেছে।'

'তা কী করে হয়?'

"আবার তক্কো! কেন হয় না?'

'প্রথমত রঙমহল এখান থেকে অনেক দূরে। দ্বিতীয়ত, সাজঘরে কাক ঢুকবে কী করে?'

'তুমি একটি গবেট। জানলা গলে এসে, টেবিল থেকে আমার হাতঘড়ি নিয়ে কাক উড়ে গিয়েছিল কী করে? সাক্ষীকে যখন সওয়াল করবে, তখন সব দিক ভেবে করবে। আগে, পরে, জীবনে যা দেখেছ, সব খেয়াল রেখে, তবেই চেপে ধরবে, তা না হলে, আদালতে জজসায়েবের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কেস ফরদাফাই হয়ে যাবে। মনে রাখবে সবসময়, বাঘে বাঘে লড়াই। মক্কেল হল ভেড়া, আর মহামান্য আদালত হল, রাজার সিংহাসন। তুমি প্রমাণ করতে পারো, এটা কাকে উড়িয়ে আনেনি? পৃথিবীর কোনও কাক, কোনওদিন এটা

নিয়ে উড়তে পারেনি। বেনিফিট অব ডাউট, অত সোজা ব্যাপার নয়! বুঝলে মাস্টার?

বেনিফিট অব ডাউট মানে?

ডাউট মানে সন্দেহ।

আর বেনিফিট মানে উপকার, তার মানে উপকারের সন্দেহ।

তোমার মুন্ডু, গ্রামার সব ভুলে গেছ। অব যার আগে বসে, বাংলায় র তার পরে বসে। ডাউটের আগে অব। তার মানে, সন্দেহের উপকার বা সুযোগ। যেহেতু প্রমাণ করা গেল না, সেইহেতু আসামি বেকসুর খালাস। কাক কি তোমার তেমন প্রাণী? তোমার মায়ের স্টেনলেস স্টিলের কত চামচ নিয়ে উড়ে গেছে, খবর রাখো? সেদিন একটা খুন্তি নিয়ে চলে গেছে। কাক ইজ এ ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল। আমার সঙ্গে পারবে না, আমি এক বাঘা অ্যাডভোকেট।

কাককে অ্যানিমেল বলা ঠিক হবে! অ্যানিমেল মানে তো জন্তু। বার্ড বলুন।

শোনো, এটা তর্ক করার জায়গা নয়। আমরা একটা মিশনে বেরিয়েছি।

পরচুল গো! বলে লাঠির আগায় ধরা চুল খালের দিকে ছুড়ে দিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক রাশ অন্ধকার উড়ে গেল চিকচিকে জলের দিকে।

আমি বললুম, এখানে তা হলে নেই।

এখানে মানে? তোমার সামনে এই যে বিশ্বচরাচর পড়ে আছে, এ কি তোমার এখানের আওতাতেই শেষ হয়ে গেল! এখান থেকে সেখান, সেখান থেকে সেখান, দূর থেকে আরও দূর। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু, দৈর্ঘ্য জানা আছে?

না

কী করো সারাদিন? কেবল ব্যাডমিন্টন আর ক্রিকেট? পৃথিবীর খবর রাখার চেষ্টা করো না। ভীষণ ব্যাকওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছ, সাবধান!

কত? না বকে বলে দিন না।

দেখি টর্চটা ধরো। আমার নোটবুকে লেখা আছে।

টর্চ হাতে নিলেই আমার নেবাতে আর জ্বালাতে ইচ্ছে করে। বেশ লাগে। এই জ্বলছে, এই নিবছে। এই আলো এই অন্ধকার। আর একটা ইচ্ছে, কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে, পাশে বসে থাকলে, চুপিচুপি হাত বাড়িয়ে যে-কোনও একটা রিড চুক করে টিপে দি পিক করে উঠলেই গাইয়ে চমকে ওঠেন। সুর গোলমাল হয়ে যায়। বেশ মজা লাগে। বকুনি খাবার ভয়ে টর্চের বোতামে আর হাত দিলুম না। দাদু পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুক বের করে, পাতা উলটে উলটে একটা জায়গায় থামলেন। আলোর সামনে ফেলে একটু নিচু হয়ে দেখে বললেন, ওপর থেকে মাটি ফুড়ে সোজাসুজি কেন্দ্র ধরে নেমে এলে বারো হাজার সাতশো তেরো দশমিক দুই পাঁচ কিমি।

আর গা বেয়ে হড়কে হড়কে নামলে?

সে পরে, দিনেরবেলা বই দেখে বলব। এখন এইটাই মুখস্থ করো, বারো হাজার সাতশো তেরো দশমিক দুই পাঁচ।

ভীষণ শীত করছে দাদু।

তা তো করবেই। পড়ার কথা হলেই শীত করবে, দাঁত কনকন করবে, পেট খোঁচাবে, হরেক বায়নাক্কা হবে। সাধে ধড়াদুম ঠ্যাঙানি খাও! ওইজন্যে খাও, স্বভাবের জন্যে।

ঢং করে কোথাও একবার ঘড়ি বাজল। বললুম, বাব্বা, রাত একটা বাজল।

কে বলেছে?

ওই যে ঘড়ি বাজল।

সাড়ে হতে পারে।

কোন সাড়ে?

যে-কোনও সাড়ে। এগারো, বারো।

একে আর সাড়ে হবে না, দেড়, আড়াই, সেই আবার তিনে গিয়ে সাড়ে। কেন দাদু?

নিশ্চয় কোনও ব্যাপার আছে। নিয়ম ছাড়া জগৎ চলে না। আইন ছাড়া আদালত চলে না। কাল সকালে ব্যাকরণ দেখে বলে দোব।

দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। কেমন একা এক ফরফর করে চলে আসছে! দাদু বললেন, টর্চ নেবা, নেবা। শিগগির লুকিয়ে পড়, ভাঙা গাড়ির ওপাশে।

কেন দাদু?

প্রশ্ন পরে।

দুজনে লুকিয়ে পড়লুম। একটা জিপ চলে গেল। দাদু মাথা বাড়িয়ে এপাশ ওপাশ দেখে বললেন, অল ক্লিয়ার। উঠে দাঁড়াও।

উঠে দাঁড়াচ্ছি, প্যাঁ করে কে যেন কেঁদে উঠল আমার পায়ের কাছে। উরেব্বাস। পৃথিবী কাঁদছে। দাদু, পৃথিবী বোধহয় কাঁদছে।

পৃথিবীর কান্না তুমি কী করে শুনতে পেলে? সে কান্না শুনতে পান মহাপুরুষরা।

আমি আর একবার পা ফেলতেই বেশ জোরে প্যা শব্দ হল।

ওই শুনুন।

হ্যাঁ রে, তাই তো রে, তোমার দুঃখেই পৃথিবী কাঁদছে।

দাদু আমার পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেললেন। একটা পুতুল পড়ে আছে, সেই পুতুল যার পেট টিপলে, হাওয়া বেরিয়ে শব্দ হয়। তোলার জন্যে নিচু হচ্ছিলুম, ধমক দিলেন, খবরদার না। সরে এসো, হাত দিয়ো না। আমি আলো ফেলছি, দেখো তো ফুলটুল কিছু পড়ে আছে কি না!

ফুল? ফুল থাকবে কেন দাদু? এখানে তো ঠাকুর নেই। একটা গাড়ি ভাঙা পড়ে আছে।

মুখে মুখে তর্ক না করে যা বলছি তাই দেখো। কীসে কী হয় তোমার জানা নেই।

সামনে ঝুঁকে ফুল খুঁজতে লাগলুম। টর্চের আলো যেখানে যেখানে পড়েছে, সেই জায়গাটা যেন বিড়বিড় করছে। এতকাল শুনে এসেছি মাটি হল প্রাণহীন বস্তুকণা। মাটিতে প্রাণের জন্ম হয়, তা বলে মাটির কোনও প্রাণ নেই। এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার, মাটি যেন চালভাজার মতো ফুটছে। মাঝরাতে পৃথিবীর চেহারা কি এইভাবেই বদলে যায়? কী জানি বাবা! একে শীত তায় ভয়ে শীত যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়িতে পুরনো আমলের পেছন-উঁচু একটা চেয়ার আছে। চেয়ারটা বাবা নিলাম থেকে কিনেছিলেন। ইংরেজ আমলের কোন এক বড় সায়েব বসতেন। আমার তো কিছুই তেমন মনে থাকে না, খেলার কথা ছাড়া, নামটা ভুলে গেছি। সেই চেয়ারটা রাতে কেমন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আপনি আপনি সরে যায়, কেউ যেন ঠেলে সরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। নানারকম শব্দ হয়। মা একদিন দুপুরে বসে বই পড়ছিলেন। আমি ঘরের একপাশে বসে ঘুড়ি জুড়ছিলুম। মা একটু করে পড়েন, আর বলেন,খোকা ঠেলছিস কেন? কী মজা, আমি কোথায় আর মা কোথায়? শেষে মা ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললেন,

তোর মতো অসভ্য ছেলে যে বাড়িতে সে বাড়িতে কারুর কিছু করার উপায় আছে! আমি বললুম, বা রে, যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুমি রয়েছ দক্ষিণ কোণে, আর আমি রয়েছি উত্তর কোণে তোমার চোখের সামনে, আমি কি ভূত যে এখান থেকে বসে বসে তোমার চেয়ার ঠেলব? বড়দের যেমন দোষ আছে, তেমনি গুণও আছে। বোঝালে বোঝেন। আমাদের মতো অবুঝ নন। সেই থেকে মা আর ওই চেয়ারটায় বসেন না। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকেন।

দাদু হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, ওই যে, ওই যে। একটা জবা আর গোটাকতক নয়নতারা ফুল, একটুকরো ছেঁড়া কাপড় পড়ে আছে।

এসব কী দাদু?

তুমি আগে আমার কাছে চলে এসো। পরে প্রশ্ন, মাড়িয়ে ফেলেছ নাকি?

না, মাড়াইনি।

দাদু আমার মাথায় হাত রেখে বারকতক ইষ্টমন্ত্র জপ করলেন।

ফুল কোথা থেকে এল দাদু?

ওসব তুমি বুঝবে না। একে বলে ডাকিনীবিদ্যা। এই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এই রাত সাধুদের যেমন সাধনার সময়, পাপীদের তেমনি পাপের সময়। আমাদের চারপাশে যেমন দেবতারা ঘুরছেন, তেমনি আবার শয়তানও ঘুরছে। এখন কী মনে হচ্ছে জানো?

কী দাদু? পরচুলটা খালের জলে না ফেললেই হত। আজই সকালে কাগজে পড়লুম, এক অভিনেতার রহস্যজনক নিরুদ্দেশের খবর। তা হলে কি?

তা হলে কী দাদু?

তিনি কি বেঁচে নেই?

তার মানে?

তুমি ওসব বুঝবে না ছোকরা, এসব হল আইনের জগতের ব্যাপার। শার্লক হোমস হলে, কি তার সহকারী ওয়াটসন হলে বুঝতে পারতে। একেই তোমার বুদ্ধি কম, তার ওপর এই ঠান্ডায় তোমার বুদ্ধি জমে বরফ হয়ে গেছে।

এখানে তো নেই। এবার তা হলে কোথায় যাব?

চলো, ওই বটগাছটার তলায়, ওখানে অনেক খাঁজখোঁজ আছে। হাতটা গোল করে আলোর মুখে ধরে দাদু গাছের ডালে মারলেন। আলোর রেখা ডাল স্পর্শ করে সোজা আকাশের দিকে ছায়াপথের মতো উঠে গেল, এই প্রথম অবাক হয়ে দেখলুম আকাশ পৃথিবী থেকে কত দুরে! আমাদের টর্চের আলোটা ভুতোমামার তুবড়ির মতোই শক্তিহীন। প্রত্যেক বছর খুব হাঁকডাক করে প্রতিযোগিতায় নাম দেন। তুবড়ি দশ-বারো ফুট তেড়ে উঠেই, দমাস করে খোল ফেটে যায়। একেবারে নাবালক।

বটগাছের ডালে বিউটিফুল একটা ঘুড়ি আটকে আছে। এখনও ছিড়ে ফরদাফাই হয়নি। বুকটা কেমন যেন করছে। দাদুর অনুমতি পেলে, তরতর করে ডালে উঠে গিয়ে ঘুড়িটা পেড়ে আনতুম। এসব গাছ আমার কাছে কিছুই নয়। দুপুরবেলা অঙ্ক ছেড়ে, অনুবাদ ছেড়ে, গাছে চড়াটা এমন আয়ত্ত করে ফেলেছি, আমার সঙ্গে কেউ পারবে না। আমরা যে-যে জিনিস ভাল পারি তার কোনও পরীক্ষা বড়রা কোনওদিন নিতে চান না। তা হলে যে ফাস্ট হয়ে যাব। ওই যত অঙ্ক কষো, কবিতার লাইন মুখস্থ লেখো। কবিতা তবু ভাল; কিন্তু ওই ব্যাকরণ! শব্দরূপ, ধাতুরূপ! আমি যখন বড় হব, তখন আমি মন্ত্রী হব, শিক্ষামন্ত্রী। সব আমি তখন পালটে দোব।

দাদু বললেন, উটমুখো হয়ে কী ভাবছ বলো তো। গাছের ডালে ঈশ্বরদর্শন হল নাকি?

দাদু, ঘুড়িটা পেড়ে আনব? এক মিনিট সময় লাগবে।

একটা ঘুড়ির দাম কত? ধারে সুতো দেওয়া হলে তিরিশ পয়সা। অর্ডিনারি হলে কুড়ি পয়সা। একটা

জীবনের দাম কত?

জীবনের আবার দাম কী? মানুষ কি কোথাও বিক্রি হয়? আগে নাকি হত? কোথায় যেন দাস-ব্যাবসা হত। শেকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে, চাবুক মারত। এই তো ছিল মানুষের জীবনের দাম? .

খুব পেকেছ আর কেনই বা পাকবে না! যা দিনকাল পড়েছে! এখন ফল পাকে না। মানুষ অকালে পেকে যায়।

দাদু টর্চ নামিয়ে গাছের গোড়ায় আলো ফেললেন। উচু ঢিবির ওপর সিঁদুর মাখানো একটা গোল পাথর দেবতা হয়ে বসে আছেন। সকালে মনে হয় ফুল দিয়ে পুজো হয়েছিল। দুটো ধেড়ে ইঁদুর আলোর ভয়ে ন্যাজ গুটিয়ে কোটরে গিয়ে ঢুকল। দুজোড়া চোখ জ্বলছে! কী সাংঘাতিক দৃষ্টি। রাতে যেন গাছতলায় মানুষের আসা বারণ।

দাদু বললেন, নাঃ, ত্রিসীমানায় নেই। কোন চুলোয় মরতে গেল কে জানে?

এবার দাদু আর ভাল লাগছে না, বাড়ি চলুন। এবার পুলিশ এসে ধরবে!

আঃ, তা হলে তো বেঁচে যাই। আমাকে আর কষ্ট করে যেতে হয় না। পুলিশকেই তো আমি চাইছি এখন। মনে হচ্ছে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোতে পারে।

ব্রিজের দিক থেকে নেচে নেচে একটা লন্ঠনের আলো এগিয়ে আসছে। লোকটি কী বোকা! বোধহয় গ্রামের মানুষ। কলকাতার রাস্তায় যে আলো জ্বলে

জানা নেই। ও বাবা, একজন নয়! অনেকে আসছে। ছেলেধরা নয় তো? দাদুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম।

কারা আসছে বলো তো?

ছেলেধরা।

গাধা! রাতে কেউ ছেলে ধরতে বেরোয়? মনে হয় মাছ ধরতে যাচ্ছে। দেখছ না, হাতে লণ্ঠন রয়েছে।

দলটা কাছাকাছি আসতেই কানে এল, বলো হরি, হরি বোল। থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে। মাঝরাতে কতদিন এই শব্দ শুনে মাকে আঁকড়ে-মাকড়ে ধরেছি। মনে হয়েছে কেউ যেন আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। ছেলেধরা বলেছিলুম, ঠিকই বলেছিলুম।

দলটা আমাদের কাছাকাছি আসতেই লণ্ঠন হাতে দলপতি থমকে দাঁড়ালেন। সন্দেহের চোখে দাদুর বিশাল চেহারার দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন কে জানে, বেশ ভক্তিভরে বললেন, সেপাইজি, কাশীমিত্তির আর কতদূরে?

দাদু বললেন, আমি সেপাইনই গো কত্তা। কাশীমিত্তির প্রায় এসে গেছে। সোজা চলে যাও। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বিষ্টুপুর।

কে গেল?

বউটা গেল গো।

কী হয়েছিল?

অনশন গো কত্তা। স্বদেশি রোগে সরে পড়ল।

জোর করে খাওয়াতে পারলে না?

কিছু থাকলে তো খাওয়া। স্বাধীন হয়েচি না বাবু? কেউ গন্ডেপিন্ডে খেয়ে মরচে, কেউ মরচে না খেয়ে। দেশলাই আছে বাবু? একটা তা হলে বিড়ি খেতুম!

আমি বাবা ধূমপান করি না। তোমার হাতেই তো আগুন রয়েছে।

দেখছেন বাবু, মাথাটা একেবারে গেছে। চল রে রঘু, চল, পা চালিয়ে চল বাবা।

তারা হরিবোল বলতে বলতে চলে গেল। দাদু তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, ভগবান, তোমার কী বিচার!

দাদু খালের ঢালুর দিকে এগোতে লাগলেন।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন দাদু?

খালধারটা একবার ভাল করে দেখি।

ওই গড়ানে জায়গায় পড়ে গেলে কী হবে? ওখানে মানুষ যায়?

মানুষ কোথায় না যায়! স্বর্গে যায়, নরকে যায়। হিমালয়ে যায়, চাঁদে যায়।

ও সব যাবার মতো জায়গা, পচা খালধার একটা যাবার মতো জায়গা হল!

বিপদে পড়লে মানুষকে কোথায় না যেতে হয়! ওই তো ওরা শ্মশানে গেল!

খালধারে নেই দাদু, থাকলে সাড়াশব্দ পাওয়া যেত।

তা ঠিক। চলো তা হলে, ব্রিজের দিকে যাই। ওখান থেকে বায়ে বাক নিয়ে, সেই গালা তৈরীর কারখানার পাশ দিয়ে সোজা চলে যাই রেল ইয়ার্ডে।

রেল ইয়ার্ডে! সেখানে রাতে কী হয় জানেন?

জানি। ওয়াগন ভাঙা হয়, তাতে আমাদের কী! আমরা আমাদের কাজ করব, ওরা ওদের কাজ করবে। রেলইয়ার্ড কারু একার সম্পত্তি নয়, সকলের।

কেউ যদি বলে আমার একার, তার নামে একটা কেস ঠুকে দোব। নাও চলো, তোমার ভয় করছে? ভয় করলে বাড়ি চলে যাও। মনে আছে, শেক্সপিয়ার কী বলেছিলেন? ভীরু প্রকৃত মরার আগে হাজারবার ভয়ে মরে, সাহসী মরে একবার।

আমি কাঁদোকাঁদো গলায় বললুম, চলুন তা হলে।

আমাদের পেছনে গাড়ির ভাঙা খাচাটা হঠাৎ একবার কেঁপে উঠল। দাদু চমকে পেছনে ফিরে তাকালেন। টর্চ ফেললেন। কটমট, কটমট শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হাড় চিবোচ্ছে। দাদু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

ওরে ব্যাটা তুই?

কে দাদু?

একটা কুকুর।

আমরা ব্রিজের দিকে এগিয়ে চললুম। পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকিয়ে আছে তারারা। মা বলেন, ওরা সারারাত ধরে সেইসব ছেলেমেয়েদের খোঁজে যারা ভাল কাজ করে, মা-বাবার কথা শোনে, লেখাপড়া করে, ভাইবোনদের মারধর করে না। খুব ভাল হলে, আকাশে একটা তারা বেড়ে যায়। রোজই নাকি বাড়ছে, আমরা হিসেব রাখি না, জানতেও পারি না। তারা যে ছাই গোনা যায় না।

এই রাতে টালার ব্রিজটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। কালো ঢেউয়ের মতো এই উঠেছে এই পড়েছে। সার সার আলো রাত-জাগা ছেলের মতো পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে। ব্রিজের তলায় রেলইয়ার্ড। একসার মালগাড়ি বিশ্রাম করছে। বেলগাছিয়ার দিক থেকে ভেসে আসছে হালকা একটা সানাইয়ের সুর।

দাদু বললেন, চারপাশে খুব বিয়ে লেগেছে। কেমন সানাই ভেসে আসছে শুনেছ! মন খারাপ করে দিচ্ছে।

ব্রিজ থেকে এদিকে-ওদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। আমরা বাদিকের সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলুম। বাববা, ব্রিজের তলায় যেন মানুষের হাট বসে গেছে! সব শুয়ে আছে গড়াগগড়। যে যা পেরেছে মুড়ি দিয়েছে আপাদমস্তক। এক কোণে একটি মাত্র আগুনের ফুটকি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। ঘুম আসেনি, কেউ একা বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। কাশির শব্দ হল, হ্যা হ্যা খ্যা খ্যা।

উঃ, মানুষের কী অবস্থা দেখেছ! গোরুরও একটা খাটাল জোটে?

মানুষ যে দুধ দেয় না দাদু!

অ্যায়, ধরেছ ঠিক। মানুষের দুধ কী?

বিদ্যা, গুণ।

কথাটা তা হলে মনে রেখো। জ্ঞানপাপী হয়ে বসে থেকে না।

আমি তো এখনও ছোট, তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই। বড় হই তখন দেখবেন। চাকরি করে প্রথম মাইনে পেয়ে কী কী কিনব জানেন?

কী কিনবে।

বিশাল বড় একটা বোমালাটাই, চার কাঠিম সুতো, দুশো চাদিয়াল ঘুড়ি, এক বাক্স গুলি, দুডজন লাটু, একটা এয়ারগান, অনেক অনেক লজেন্স আর চকোলেট, চারটে পকেট সবসময় একেবারে ঠেসে রাখব। মিনুকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব। .

মিনুর ওপর তোমার এত রাগ কেন?

মা ওকে বেশি ভালবাসে।

হিংসে। হিংসেতে তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি লেনের মোড়ের ডাক্তারখানার ভেতরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার তলায় আলোর রুলটানা। ভেতরে মনে হয় দু-তিন জন রয়েছেন। চাপা গলায় কথা হচ্ছে। ওরই মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত। হঠাৎ ঝড়াস করে দরজা খুলে গেল। একঝলক আলো ছিটকে রাস্তায় নেমে এল। দরজার সামনে কালো ছায়ার মতো বিশাল একজন মানুষ। টাকে আলো পড়ে চকচক করছে। ভদ্রলোক খুব রেগে গেছেন। তেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, ভেতর থেকে একজন হাত চেপে ধরে বলছেন, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে অসীম এই রাত একটার সময়!

ব্রিজের অন্ধকার ছায়ায় আমি আর দাদু লেপটে আছি। বেশ ভয় ভয় করছে। আমি দেখেছি যখনই আমার মনে হয় এইবার একটা কিছু হবে তখনই একটা কিছু হয়।

যে লোকটির হাত চেপে ধরা হয়েছিল, তিনি এক ঝটকা মেরে বললেন, না, আমি তোমাদের কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। আমাকে ছেড়ে দাও।

ভদ্রলোক ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেই, কেমন যেন টলমল করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে পথেই বসে পড়ছেন। বুকে হাত চেপে ধরেছেন। দোকানের ভেতর থেকে দুজন বেরিয়ে এসে বলছেন, কী, হল কী? অমন করছ কেন?

হা, হা।

হা মানে? হাওয়া খাবে? হাওয়া?

হা, হা।

একজন বললেন, আরে ওর তো হার্টের গোলমাল ছিল। অ্যাটাক হয়েছে। ছেলেটাকে তুমি কোথায় রেখেছ? ছেলেটাকে?

মা, মা।

শেষ সময়, মাকে ডেকে কী হবে? তুমি সব গোলমাল করে দিলে! ছেলেটাকে রাখলে কোথায়?

আমরা দুজন অন্ধকারে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছি। দাদু এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরে আছেন। বলা যায় না, আমি হঠাৎ কথা বলে ফেলতে পারি। কী যে হচ্ছে, কে জানে? দুজনের একজন আমাদের দিকে তাকালেন। গলা চড়িয়ে বললেন, কে ওখানে, কে?

আমরা আর একটু অন্ধকারের দিকে সরে এলুম। সাড়াশব্দ না পেয়ে আর একজন বললেন, আরে, আজ দুপুর থেকে ওখানে এক পাগলা এসে আস্তানা নিয়েছে। নে চল, ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাই। নে, এবার খুনের দায়ে না পড়তে হয়?

ভদ্রলোককে চ্যাংদোলা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। যাক বাবা, বাঁচা গেছে। পায়ে যা মশা কামড়াচ্ছিল! দাদু ফিসফিস করে বললেন, পা চালাও, আর এখানে নয়। লোক তিনটেকে আমার তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না হে। যদি মারা যায়, এও একধরনের মার্ডার। জানে হার্টের রুগি, তাও হাত ধরে টানাটানি, ধাক্কাধাক্কি। আমি আর তুমি সাক্ষী রইলুম। প্রয়োজন হলে আদালতে যেতে হবে।

দাদু, ভদ্রলোক হা হা করে হার্ট বোঝাতে চাইছিলেন, মা মা বলে কী বলতে চাইলেন?

ওই দেখো, তুমি একটু আগে মায়ের বিচার করছিলে, তাই না! মা ছাড়া জগতে কেউ নেই। বুকের যন্ত্রণায়, অত বড় একটা লোক, সেও মা মা করে মাকে ডাকছে! দেখে শেখো।

আমার হার্ট খুব ভাল।

মনে তো হয় না, তোমার বোনের ওপর যা হিংসে! ও

সেদিন দুপুরে একা একা আইসক্রিম খেয়েছে। আমার জন্যে রাখেনি কেন?

গবেট ! সময় আর আইসক্রিম কারুর জন্যে রাখা যায় না। গলে বেরিয়ে যায়। লেখাপড়া শিখে তোমার যা বুদ্ধি হচ্ছে! সারাজীবন ধোপার কাপড় না বইতে হয়!

কথা বলতে বলতে আমরা শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি লেনে ঢুকে পড়েছি। এখন বেশ ভালই লাগছে। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি। দাদু পুট করে টর্চের বোতাম টিপলেন। নর্দমার পাশে জলা জায়গায় বুনোগাছের ঝোপে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। কী রে বাবা, বাঘ নাকি! হতেও পারে। কাগজে দিয়েছে, পাটনার রয়াল সার্কাসের বাঘটা পালিয়েছে। বলা যায় না, জি টি রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে হয়তো কলকাতায় চলে এসেছে। সামনের বাড়ির নীচের ঘরে কাশির শব্দ হতেই দাদু টর্চ নিবিয়ে দিলেন।

ঝোপের মধ্যে ওটা কী দাদু!

কুকুরবাচ্চা। শীতে কাঁপছে। আমাদের দেশের কুকুররা বড় অবহেলিত। দেখার কেউ নেই। এত সব প্ল্যান হচ্ছে, কুকুরদের জন্যে কোনও প্ল্যান নেই। একটা করে ডগ হাউস বানাতে পারে। কত আর খরচ!

হট হাউস কাকে বলে দাদু?

হট হাউসে গাছপালা রাখে, সে আলাদা জিনিস।

আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। রাত যত বাড়ছে কুয়াশায় চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ব্রিজের ওপরে সার সার বাতির চোখে যেন ধীরে ধীরে ছানি পড়ে

আসছে। কিছু দূরেই একটা ব্যায়াম সমিতি। নাম লেখা বোর্ডের ওপর আলো বুকে আছে। নামটা ভারী সুন্দর, ভাস্কো ডা গামা স্পোর্টিং ক্লাব। সামনে একটা খোলা জায়গা। ফুলগাছ দিয়ে ঘেরা। তাজা তাজা গাদা ফুটেছে। ক্লাবটাকে দেখলেই ভাল লাগে। পাকা বাড়ি নয়, আটচালা। রেখেছে বেশ সুন্দর করে।

টুং টাং, লোহায় লোহা ঠোকার শব্দ আসছে। এত রাতে কে আবার কী করছে! আর একটু এগিয়েই আমরা অবাক হয়ে গেলুম। বিশাল চেহারার এক ব্যায়ামবীর, একা একা দুপা ফাঁক করে বারবেল ভাজছেন। গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। সাদা শর্টস। দু কবজিতে দুটো সাদা ব্যান্ড।

দাদু, এত রাতে কেউ ব্যায়াম করে! এখন তো ঘুমোবার সময়!

আমরা কী করছি?

আমাদের কথা আলাদা।

যার যখন সময় হয়।

ধাম করে বারবেলটা পায়ে কাছে ফেলে দিয়ে, ব্যায়ামবীর বুক চিতিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। হঠাৎ আমাদের দেখে তার শ্বাসপ্রশ্বাস থমকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, নাইট শোর সিনেমা ভাঙল?

সিনেমা। সিনেমার খবর রাখি না। বেশ তো ব্যায়াম হচ্ছিল, আবার সিনেমার খবর কেন? দাদু সিনেমার নাম শুনলে ভীষণ রেগে যান। ব্যায়ামবীর হাতের গুলি নাচাতে নাচাতে বললেন, ওইটাই আমার ঘড়ি।

কথা শেষ করেই তড়াক করে লাফিয়ে রিঙে উঠে বার্ড হয়ে ঝুলতে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপার! গভীর রাত, কেউ কোথাও নেই। শীতে সব কাপছে, একা মানুষ ব্যায়াম করে চলেছেন। .

দাদু বললেন, বুঝলে, একেই বলে সাধনা। সারাদিনে সময় হয় না, তাই এই সময়টি বেছে নিয়েছে। চেষ্টা না থাকলে, মানুষের কিছু হয় না। ফাকি দিলে ফাঁকেই পড়তে হয়।

যাই বলুন, এই সময়ে পৃথিবীর কেউ ব্যায়াম করে না। আমি শুনিনি। তোমার বয়েস কত হল যে এরই মধ্যে সব শুনে বসে আছ? নাও, নাও চলো।

শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি লেন সাপের মতো একেবেঁকে রেল ইয়ার্ডের দিকে চলে গেছে। আমরা এবার চলেছি পশ্চিম দিকে। গঙ্গার হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

রাস্তাটার শেষ মাথায় বেশ বড় একটা বাড়ি। সবুজ রং চারপাশে টুনির মালা, ফোঁটা ফোঁটা তারার মতো নরম সুরে জ্বলছে। ঝলমলে আলোর মালা দেখলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়। মনে হয় 'আরব্য উপন্যাসের' দেশে চলে গেছি। রাজকন্যা, পক্ষীরাজ, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি। বাড়িটার ঢোকার মুখে আবার নহবতখানা বসিয়েছে, ঝালরে আলোর মালা।

দাদু, আমাকে এ বছর আলোয়ারে নিয়ে যাবেন?

এত জায়গা থাকতে আলোয়ার?

ওই যে দেখুন ঝালরে কেমন আলো দুলিয়েছে। আমার ভীষণ রানা প্রতাপকে দেখতে ইচ্ছে করে, বুন্দির রাজাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

বুঝেছি, এ সবই হল সিনেমা দেখার কুফল। খুব টিভি দেখো আর গল্পর বই পড়ো।

আজ দেখছি কথায় কথায় আমার খুব বকুনি হচ্ছে। দাদুর মেজাজ তেমন ভাল নেই। কী করে থাকবে। শীতের অন্ধকার রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হলে আমারও মেজাজ চড়ে থাকত। আমরা বাড়িটার গেটের সামনে আসতেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, মাথায় সাতপ্যাচ মাফলার জড়ানো। বেশ মোটাসোটা

থলথলে চেহারা। লুঙ্গির ওপর কোট পরেছেন। চোখে চশমা। হাতে রুমাল আর নস্যির ডিবে। নাক টানলেন ফা করে, কী শব্দ ! যেন জেটপ্লেন উড়ে গেল রাত কঁাপিয়ে। ভদ্রলোক আমার দাদুর পরিচিত। দাদু বললেন, এই যে বিধান, ঘুম ভাঙল?

আরে মুকুজ্যেমশাই যে ! মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন?

মর্নি এখন অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এসেছে। ভারত মহাসাগর পেরোবে, বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আমাদের আকাশে আসতে এখনও ঘণ্টা ছয়েক লাগবে!

ভদ্রলোক মামলার কথায় চলে এলেন, জালানকে ভাবছি এবার একটু টাইট দোব।

কাল তোমার মেয়ের বিয়ে। ভালয় ভালয় সেইটা আগে শেষ করো, তারপর মামলার কথা ভাবা যাবে। আদালতের কোনও লগ্ন নেই।

দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দিন না।

এই মাঝরাতে?

আমরা তো তিনরাত জেগে আছি। মেয়ের বিয়ে চাট্টিখানি কথা! আসুন, আসুন ভিয়েন হচ্ছে। দেখলে আনন্দ পাবেন। টাবুর টুবুর পানতুয়া। আমার লাইফে অত পানতুয়া আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। রসে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তাই নাকি, তাই নাকি?

দাদু বড় বড় পা ফেলে গেটের দিকে চললেন। দুটো জিনিস দাদু ভীষণ ভালবাসেন, পানতুয়া, আর পাকা পেয়ারা। ভেতরের উঠোনে শামিয়ানা পড়েছে। গনগন করে উনুন জ্বলছে। বেশ জমজমাট ব্যাপার, মনেই হয় না রাত হয়েছে। যেন এই সবে সন্ধে হল। বিশাল কেটলিতে চায়ের জল বসেছে। সিঁ সিঁ করে

শব্দ হচ্ছে। কমবয়সি এক ভদ্রলোক ফর্দ করতে বসেছেন। তিনি কেবল বলছেন, দাদা, তাড়াতাড়ি বলো মাছ কতটা, ভোর হয়ে এল, লগনসার বাজার, শেষ রাতে গিয়ে ধরতে না পারলে পাকা বিশ-তিরিশ কেজির মাছ পাব না।

আহা, তুই আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস কর।

আঃ, ঠাকুরমশাই এই সময় আবার ফুড়ুত করে পালালেন কোথায়? আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবু। আসছে আসছে, একটু দম নিতে গেছে।

হ্যাঁ গো, দেরাজের চাবিটা রাখলে কোথায়, সুমি দুলটা একবার দেখতে চাইছে।

চাবি তো তোমার কাছে!

কী সর্বনাশ! চাবি তো তোমার কাছে। সন্ধেবেলা সেজ ঠাকুরপোকে দইয়ের অ্যাডভান্স বের করে দিয়ে তোমাকে দিলুম না! পাঞ্জাবির পকেটে রাখলে!

পাঞ্জাবি তো ছেড়ে ফেলেছি, হ্যাঙারে ঝুলছে।

তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি আর পারব না। পাগল হয়ে যাব।

আসুন মুকুজ্যেমশাই, এদিকে আসুন, পানতুয়ার বাহার দেখে যান। গণেশ, মুকুজোমশাইকে এক ভাঁড় চা দিস। খোকা, তুমি চা খাও?

না, আমি চা খাই না।

তা হলে তুমি পানতুয়া খাও।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে ঠাকুর এলেন, পানতুয়ায় বাবু এখন হাত দেওয়া চলবে না। সেট করেনি, চমকে দিলে মাল নষ্ট হয়ে যাবে। একনজর শুধু দেখে নিন। বেশি নজর দিলে মাল এলে যাবে।

সে কী, আমি যে মুকুজোমশাইকে ডেকে আনলুম।

আমাদের বাবু কিছু তুকতাক আছে। কাল খাবেন। বারো-চোদ্দো ঘণ্টার ব্যাপার তো !

সার সার টবে টাবুর টুবুর পানতুয়া। গন্ধে একেবারে মাত করে দিচ্ছে। আরশোলার মতো রং ধরেছে। এক-একটার সাইজ কী, ঠিক যেন টেনিস বল। দাদু আর আমি দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি হাঁ করে। একসঙ্গে এত টগরবগর পান্তুয়া জীবনে দেখিনি। নতুন মাটির গেলাসে চা এসে গেল দাদু আর ভদ্রলোকের জন্যে। গেলাসের মাটি চা টানছে, সিঁ সিঁ শব্দে।

ভদ্রলোক বললেন, এত রাতে এমন সেজেগুজে নাতিকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন মুকুজ্যেমশাই?

আর বোলো না, একেই বলে কপালের গেরো। টুসিকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

টুসি? টুসি কে?

জজসায়েবের স্ত্রী আদর করে একটা কাবলি বেড়াল দিয়েছিলেন আমার মেয়েকে। সেই বেড়াল সন্ধের মুখে নিরুদ্দেশ। সাতটা বাজে, আটটা বাজে, ফেরার নাম নেই। মেয়ে তো কেঁদেকেটে অস্থির। খাওয়াদাওয়া বন্ধ। যত রাত বাড়ে ততই বলে, এই শীতের রাত, বিশাল এই পৃথিবী, কত রকমের বিপদ, পথ ভুলে কোথায় গিয়ে বসে রইল, কি মরেই গেল, ধেড়ে ধেড়ে কুকুর ঘুরছে। খাওয়াদাওয়া শিকেয় তুলে সে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে হাপুস নয়নে কাদছে। মায়া বিধান, মায়া। জগৎটা মায়ার বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

কাবলে বেড়াল কীরকম দেখতে হয় মুকুজ্যেমশাই?

আহা, সে রূপের কোনও তুলনা হয় না। সাদা ধবধবে। চামরের মতো ন্যাজ। মিষ্টি এতটুকু মুখ। মিউ করে যখন ডাকে, মনে হয় পিয়ানো বাজছে।

মানুষ তার কাছে লাগে না ও সব হল কোলে কোলে থাকার জীব। চললুম হে। কাল দেখা হবে। হ্যাঁ, কালকের মেনুটা একবার শুনে যাই, ফিশফ্রাই থাকছে?

ফিশফ্রাই ছাড়া চলে! ফ্রাই থাকছে, মাটন দোপেয়াজা থাকছে, রাতাবি সন্দেশ থাকবে, ভুলভুলাইয়া চাটনি থাকবে।

সে আবার কী জিনিস?

আমিও ঠিক জানি না। আমাদের ঠাকুরের নতুন আবিষ্কার।

সাসপেন্সে রইলুম। দইটা বেশ জমবে তো?

এ-ক্লাস দোকানের সুপার ক্লাস জিনিস।

মাথাটা যেন আমার জন্যে থাকে।

সে আর বলতে? চল্লিশটা মাথা। কটা খাবেন খান না। ফাটাফাটি ব্যাপার।

রাস্তায় নেমে দাদুকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, দই কি রাবণরাজা? চল্লিশটা মাথা?

তুমি সত্যিই একটি গবেট। চল্লিশ হাঁড়ি দই আসবে। চল্লিশের চল্লিশটা মাথা। তোমার কমনসেন্স একেবারে নেই। আইনে তুমি সুবিধে করতে পারবে না।

আমি তো আরও বড় হব।

বাচ্চা গাধাও গাধা, বড় গাধাও গাধা। দেহটাই বাড়বে। মগজ ঢুঁ ঢুঁ।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা রেল ইয়ার্ডে এসে পড়লুম। একেবারে ভূতুড়ে জায়গা। ডান পাশে বিশাল একটা গোরস্থান। এইবার আমার ভীষণ ভয় করছে। মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে। মা এখন টুসি টুসি করছেন। আমার চেয়ে টুসি আদরের। কত কী ভাল ভাল জিনিস খায়! আমি যদি টুসি হতুম!

বেড়ালকে কীভাবে ডাকতে হয় জানো?

চুকচুক করে।

সঙ্গে একটা আয় যোগ করো, আয় আয়, চুকচুক। দাদু, আমার মনে হচ্ছে, বেড়াল এভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বেড়াল খোজার অন্য কায়দা আছে।

যা বলি তাই করো, মাঝরাতে তক্কো কোরো না। নাও, ওই মালগাড়িটার তলায় নিচু হয়ে যা বললুম তাই করো। আমি আলো নিবিয়ে রাখছি। বাঘে আর বেড়ালে বিশেষ তফাত নেই। আলো দেখলেই ভয় পেয়ে যাবে।

যেই না আয় আয়, চুক চুক করেছি, সাত দিক থেকে সাতটা, সাতরকম চেহারার কুকুর ছুটে এসে আমাদের গোল করে ঘিরে ন্যাজ নাড়তে লাগল।

দাদু, টুসি আর এখানে নেই, ওদের পেটে আছে।

হ্যাঃ তুমি সব জানো! অত সহজে বেড়াল কুকুরের পেটে যেতে পারে না। বেড়াল হল বাঘের মাসি। অলক্ষুনে কথা যত কম বলো ততই ভাল।

এইবার এদের নিয়ে কী করবেন? সব কটা মুখের দিকে তাকিয়ে পটাপট ন্যাজ নাড়ছে।

কী আর করব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। ন্যাজ নাড়তে নাড়তে একসময় ক্লান্ত হয়ে চলে যাবে।

অনেক দূরে ভারী একটা কিছু পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর সাতটা ভেউ ভেউ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেইদিকে ছুটল।

দাদু, আবার চুকচুক করব?

না হে, জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়। এখানে সাবধানে চোরের মতো কাজ করতে হবে। ওয়াগন ব্রেকারের উৎপাত আছে। বেশি গোলমাল করলে গুলি করে শেষ করে দেবে। এখন আমরা শুধু চাকার তলায় তলায় উঁকি মেরে দেখব। শীতে কোথাও জবুথবু হয়ে বসে আছে কি না।

এই এত মালগাড়ি, জোড়া জোড়া চাকা, সব কি দেখা যাবে দাদু?

যাবে বলে কিছু নেই, যাওয়াতে হবে।

ট্রেন ইনসপেক্টরের মতো আমরা দুজনে মালগাড়ির চাকার তলায় উঁকি মারতে মারতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। আজ বরাতে কী আছে ভগবানই জানেন। একটা মালগাড়ি যে কত লম্বা হতে পারে আমার দাদুও জানতেন না। আমরা ন্যাজ ছেড়ে মালগাড়ির পেটের কাছে চলে এসেছি। মুখ আসতে এখনও অনেক দেরি। হঠাৎ কানে একটা শব্দ এল। কে যেন খুব সরু গলায় ডাকছে, মা, মা।

আমার কান খাড়া হবার আগেই, দাদুর কান খাড়া ছিল। ও

ই শোনো, টুসি ডাকছে।

ঠিক যেন মানুষের গলা দাদু।

পশুতে আর মানুষে তফাত কতটুকু বুনো!

যাক বাবা, সারাদিনে দাদু এই একবার আমাকে 'বুনো' বলে ডাকলেন। এ ডাক হল আদরের ডাক। মা, মা ডাকটা আর বারকয়েক হয়ে থেমে গেল।

ডাকটা কোথা থেকে আসছে বলো তো?

মালগাড়ির এই কামরাটার ভেতর থেকে।

ঠিক শুনেছ? এর ভেতর ঢুকল কী করে! নিশ্চয় মাছের গন্ধ পেয়েছে!

দাদুর কথা শেষ হতে-না-হতেই স্পষ্ট কানে এল শিশুর গলা, মা, জল।

আমি আহ্বাদে আটখানা হয়ে বললুম, দাদু, টুসি কথা শিখে গেছে। মায়ের কী ট্রেনিং!

চুপ। দাদু ধমকে উঠলেন। এ টুসি নয়, বাচ্চার গলা, এর মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। দাঁড়াও, দাঁড়াও।

কোনও কিছু ভাবার সময় দাদু দাঁড়াতে বলেন।

হয়েছে, হয়েছে, আজই সকালে কাগজে পড়লুম, কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী বলরাম দাসের ছেলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সারা কলকাতা তোলপাড় হচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছেন। কী কাণ্ড, সেই ছেলে, এর ভেতর ঢুকে বসে আছে!

কাল কলকাতায় কী ছিল দাদু! এত লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? মেলা ছিল নাকি!

তোমার মুন্ডু ছিল। কলকাতায় রোজ কত লোক নিরুদ্দেশ হয় জানো! নষ্ট করার মতো আর সময় নেই। এখুনি উদ্ধার করতে হবে। আহা বেচারা!

দাদু হাতের আড়াল করে টর্চের আলো ছুড়লেন। দরজায় ঢাউস এক তালা ঝুলছে।

সেরেছে, এ যে দেখছি বিশাল এক তালা ঝুলছে! ভাঙতে হবে।

একজন ওয়াগন-ব্রেকারকে ডেকে আনব? ওরা ঝট করে ভেঙে দেবে।

পাগল হয়েছ। হাতে দড়ি পড়ে যাবে, কি বুকে বুলেট!

ঘ্যাড়াং ঘাড়াং করে সাংঘাতিক এক শব্দে রাত কেঁপে গেল। গাড়ির বগিগুলো সামনে পেছনে দুলে উঠল।

দাদু চমকে উঠে বললেন, কী হচ্ছে হলো তো!

বোধহয় ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে দাদু ও তো রোজই একটা করে হয়, আজই বা কেন বাদ থাকে!

মালগাড়িটায় হঠাৎ যেন কীসের টান ধরল। ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে লাগল। দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ধরো, ধরো, পালাচ্ছে।

কী যে বলেন দাদু! যারা একটা বেড়াল ধরতে পারে না, তারা ধরবে এত বড় একটা মালগাড়ি! গাড়ির গতি বেড়ে গেছে। ঘটাং ঘটাং করে সামনে এগিয়ে চলেছে। দাদু বললেন, নাম্বার লিখে নাও, নাম্বার লিখে নাও।

মোটরগাড়ির নম্বর থাকে পেছনে। মালগাড়ির নম্বর কোথায় থাকে দাদু? এর তো আষ্টেপৃষ্ঠে সর্বত্র কত কী লেখা। ওই যে আপনি টর্চ ফেলেছেন, লেখা রয়েছে, এম. টি. আবার তার পাশেই লেখা টি. আর। তার মানে?

তোমার কোনও জেনারেল নলেজ নেই। এত বড় ছেলে হলে! তোমার বয়েসের অন্য ছেলেরা কত কী জানে! নাঃ, তুমি কোনওদিন আই. সি. এস হতে পারবে না। তেলেভাজার দোকান দিয়ে সংসার চালাতে হবে।

সে খুব ভাল। রোজ কেমন ফুলুরি আর বেগুনি খাব।

চোখের সামনে দিয়ে মালগাড়ির ন্যাজ বেরিয়ে গেল। একজোড়া লাইন সামনে চকচক করছে। ওপর থেকে একঝলক আলো এসে পড়েছে। দাদু বললেন, আমরা কিছুই করতে পারলুম না। ছেলেটা চোখের সামনে দিয়ে এবার সত্যি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তুমি একটি অপদার্থ!

ওই যে দূরে গাড়িটা একেবেঁকে চলে যাচ্ছে, ওর পেছনে ছুটব দাদু!

খুব হয়েছে, ওর পেছনে ছুটে তোমাকে আর দয়া করে নিরুদ্দেশ হতে হবে না। বোকা হলেও তুমি আমার আদরের নাতি। নেই মামার চেয়ে, কানা মামা ভাল। নাও চলো, আমি এখন থানায় যাব। মনে হচ্ছে, অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। পুলিশ জানলে, তারা কিছু একটা করতে পারবে।

যাবার আগে লাইনের ওপর টর্চের আলো ফেললেন। লম্বা মতো কী একটা পড়ে আছে খোয়ার ওপর।

দেখো তো ওটা কী?

মনে হচ্ছে ডিনামাইট।

ডিনামাইট? খেপেচ, ডিনামাইট আসবে কোথা থেকে? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। নাও, তোলো।

ভয়ে ভয়ে জিনিসটা তুলে নিলুম, একটা পেনসিল দাদু!

দাঁড়াও দাঁড়াও, ওটা একটা সাংঘাতিক ক্লু, ফিঙ্গার প্রিন্ট নষ্ট কোরো না। রুমাল দিয়ে ধরি। এসব শিখে রাখো। এই একটা পেনসিল দিয়ে পুলিশ এক ডজন অপরাধী ধরতে পারে।

রুমাল জড়ানো পেনসিল কোটের পকেটে ফেলে দাদু যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। আমি বললুম, টুসির কী হবে?

টুসির ভাবনা টুসি ভাববে। আমাদের আর সময় নেই।

দূরে সাতটা কুকুর তারস্বরে কেঁদে উঠল। ভীষণ কিছু একটা দেখে ফেলেছে বোধহয়।

॥ দুই ॥

আমরা থানার সামনে এসে দাড়ালুম। কুয়াশায় চারপাশ ঝাপসা। অয়্যারলেসের টাওয়ার তিনকোনা হয়ে আকাশের টাগরায় গিয়ে ঠেকেছে। থানার সামনের মাঠে ধোঁয়া ঘোঁট পাকাচ্ছে একপাশে একটা জিপগাড়ি। তার ভেতরেও কুয়াশা ঢুকে বসে আছে। অফিসঘরে টিংটিং করে গোটাকতক আলো জ্বলছে। একজন পুলিশ অলেস্টার পরে বেঞ্চিতে বসে। হঠাৎ তার হাত থেকে লাঠিটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে যেতেই চমকে উঠে বললেন, কে, কে?

ঘুমের ঘোরে মানুষের কত কী যে হয়!

দাদু বললেন, চোরের স্বপ্ন দেখছে।

চোখ না খুলেই হাতটা মেঝের দিকে ঝুলিয়ে হাতড়ে হাতড়ে লাঠিটা তুলে, হাটুর ফাঁকে রেখে পুলিশ ঘুমোতে লাগলেন। এবার অল্প অল্প নাক ডাকছে। দাদু বড় বড় পা ফেলে অফিসঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। অফিসে বিশেষ কেউ নেই। বিশাল চেহারার এক অফিসার আপন মনে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। চোখ দুটো ঘুম ঘুম।

দরজার কাছ থেকে দাদু বললেন, আসতে পারি?

ভদ্রলোক না তাকিয়েই বললেন, আসুন।

দাদু সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ধড়মড় করে উঠে টেবিল থেকে পা নামিয়ে বললেন, আরেকবাপ, মুকুজোমশাই, কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! আবার ঘটি চুরি?

দাদু বসতে বসতে বললেন, না, এবার আর ঘটি চুরি নয়, অন্য ব্যাপার। আরও সিরিয়াস কেস।

কোথায় গিয়েছিলেন? গঙ্গার চান হয়ে গেল!

অনীশ, তোমার সময়ের জ্ঞান খুব কমে গেছে। এখন মাঝরাত। মাঝরাতে কেউ চানে যায়! যাক শোনো, জিনিসটা প্রায় সমাধান করেই এনেছি, একেই বলে ভাগ্য!

ভদ্রলোক সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, ধরে ফেলেছেন সেই ঘটিচোরকে?

তোমার মাথায় কি ঘটি ছাড়া আর কিছুই নেই? এ তোমার ছিচকে চোরের ব্যাপার নয়। বাঘা বাঘা অপরাধীদের ব্যাপার। অভিনেতা নিরুদ্দেশ, ধনীর পুত্র অপহরণ। আজকের কাগজের বড় বড় দুটো খবর।

ও হ্যা, ওই কেস দুটো? বেশ জমাটি ব্যাপার। বিলিতি বিলিতি গন্ধ আছে। অনেকদিন পরে গোয়েন্দারা একটু আনন্দ পাবেন।

আনন্দ পাওয়াচ্ছি!

আজ্ঞে?

আনন্দ পাওয়াচ্ছি। তিন ঘণ্টায় আমি দুটো কেসেরই ফয়সালা করে ফেলেছি। এখন কান টানলেই মাথা আসবে।

কীভাবে?

চেয়ারে বসে বসে, কীভাবে, কীভাবে করলে কাজ হবে না। ওঠো, কোমরে বেল্ট চড়াও ফোর্স বের করো। রাত ভোর হবার আগেই সব শেষ করে দিচ্ছি।

কী বলছেন মুকুজ্যেমশাই! আপনি কলকাতার একজন নামজাদা আইনজীবী, আপনি আবার কবে গোয়েন্দা হলেন?

বেড়াল আমাকে গোয়েন্দা বানিয়েছে। আমি এখন ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছি।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, তা না হলে আমরা হয়তো বোকা বনে যাব। আর তখন কী হবে জানেন? কাগজে কাগজে লিখে আমাদের ভূত করে দেবে। আমি তো আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নই, বন্ধু। আমাকে বলতে আপত্তি কী?

তুমি তো আচ্ছা হে! এখন গুছিয়ে সব বলতে হলে, অপরাধীরা ভাগবে।

ছোট করে বলুন। টেলিগ্রাফের ভাষায়।

শোনো তা হলে, খালধারে ভাঙা মটরগাড়ি, তার ভেতর পরচুল, পায়ের কাছে শব্দ করা আলুর পুতুল, বন্ধ ডাক্তারখানায় তিনটে লোক, হার্টের গোলমালে একজন কাত, হা, হা, মা, মা, মালগাড়ির পেটে শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠ, গাড়ি হাওয়া, লাইনে পেনসিল। এই নাও রুমালে জড়ানো পেনসিল।

পুলিশ অফিসার দাদুর টেলিগ্রাফের ভাষায় ঘটনার বিবরণ শুনে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ফোর্স বের করছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ তৈরি হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে দাদুকে বললেন, এইসব কাজে, ছোট নাতিটাকে নিয়ে যাবেন? সেটা কি ভাল হবে?

আরে ওই তো আমার অ্যাসিস্টেন্ট। এতক্ষণ আমাকে সাহস দিয়ে দিয়ে চালিয়ে আনছে।

তা হলে চলুক।

গাড়ি স্টার্ট নিল। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, প্রথমে আমরা কোথায় যাব?

আমি গাইড করছি। ভয় নেই।

দাদু ড্রাইভারের পাশে বসে, ডাইনে-বায়ে করতে লাগলেন। গাড়ি চলল গড়গড়িয়ে। প্রথমেই সেই ডাক্তারখানা, যেখানে তিনজন লোক কিছু আগে গুলতানি করছিলেন। দরজার তলা দিয়ে কোনও আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে না। চারপাশ নিঝুম অন্ধকার। গাড়ি থামল। অফিসার পুলিশি গলায় বললেন, এইখানে?

দাদু ধমকে উঠলেন, 'চুপ, আস্তে আস্তে। ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছ কেন অনীশ?

অল রাইট, অল রাইট।

বেশ মজা লাগছে। চোরেরা চোরের মতো হাটবে। পুলিশ চোরের মতো হাটলে হাসি পায়। আমার দাদুই যেন পুলিশ অফিসার। তিনিই হুকুম দিচ্ছেন ফিসফিসে গলায়, ডিসপেনসারিটা ঘিরে ফেলো, ঘিরে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে পুলিশ মোতায়েন হয়ে গেল। দাদু বন্ধ দরজায় কান রেখে শোনার চেষ্টা করছেন ভেতরে কেউ আছে কি না। দরজায় কিন্তু তালা

ঝুলছে। পুলিশ অফিসার ফিসফিস করে সে কথা জানালেন। দাদু বললেন, এতদিন পুলিশে চাকরি করলে, ফলস কাকে বলে বোঝে না!

সবই বুঝি, শুধু একটা জিনিসই বুঝি না, এই ডিসপেনসারির ভেতর কে থাকতে পারে?

এর ভেতরে সেই অভিনেতাটি আছে, যার নাম অসীমকুমার! সঙ্গে আছে তার দুই চেলা।

তা, থাকে থাক না, মানুষকে তো রাতে কোথাও না কোথাও একটা থাকতেই হবে। শুধু শুধু খোঁচাখুঁচি করে তোলা কেন?

বাঃ, বললে ভাল, সে নিরুদ্দেশ হয়ে বাড়ির লোককে কাঁদিয়ে এখানে থাকবে কেন? নিশ্চয়ই সে এমন একটা কিছু করেছে, যার জন্যে লুকোতে চাইছে। কী করেছে জানো? আমি নিজের কানে শুনেছি, রাস্তায় থেবড়ে বসে বুক চেপে ধরে বলছে, ছেলেটাকে আমি মালগাড়িতে রেখেছি। কার ছেলে? সেই ধনকুবেরের ছেলে।

অসীমকুমার ধনকুবেরের ছেলেকে লুকিয়ে রাখবে কোন উদ্দেশ্যে! সব অপরাধেরই তো একটা কারণ থাকবে।

টাকা, টাকা। পৃথিবীর যত পাপ সব টাকার জন্যে। অভিনেতাদের টাকার প্রয়োজন হয়। তারা দুহাতে টাকা ওড়ায়। বড়লোকের ছেলে নিরুদ্দেশ হলে পুরস্কার ঘোষণা করবেই। তখন নিয়ে গিয়ে সামনে ধরে দেবে, টাকাটি পকেটে পুরে ফিরে আসবে। আসলে সব ভেস্তে গেল হার্ট অ্যাটাক হয়ে।

একজন পুলিশ শব্দ করে হাই তুললেন, দাদু বললেন, অ্যায় চুপ। এই যে অনীশ, দরজায় কান পাতো, ভেতরে কী হচ্ছে শুনতে পাবে।

আমিও কান লাগালুম। সত্যিই একটা সন্দেহজনক শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন কারুর গলা টিপে ধরেছে, কি গলাটা কেটেই দিয়েছে। কাটা গলায় নিশ্বাস নেবার ঘড়ঘড় শব্দ।

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দরোয়াজা তোড়ো।

তিন ধাক্কায় দরজা খুলে পড়ল। সবাই বীরদর্পে ঘরে ঢুকলেন। দাদু অনবরতই বলছেন, হ্যান্ডস আপ, হ্যান্ডস আপ। টর্চের আলো ঘরময় ঘুরছে। ভয়ে দম বন্ধ করে ছিলুম। আলো এখুনি হয়তো দপ করে এমন জায়গায় পড়বে, দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে যাব। আর তখুনই অফিসার ব্যঙ্গ করে বলবেন, প্রথমেই বলেছিলুম ছোটকে সঙ্গে নেবেন না।

ঘরে কিন্তু কেউ নেই। গোটাকতক ইঁদুর আলো দেখে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। শব্দটা আসছে কলের মুখ থেকে। ভাল করে বন্ধ করা হয়নি। আলগা মুখ দিয়ে জল হাওয়ার চাপে শব্দ করে বিজগুড়ি কাটছে।

অফিসার বললেন, এই দেখুন, আপনার কথায় নেচে কী সর্বনাশ হল। এখন চুরির দায়ে ধরা না পড়ি। কাল সারা শহরে ঢিটি পড়ে যাবে, পুলিশ দরজা ভেঙে ওষুধ চুরি করছিল। চলুন চলুন, বেরিয়ে চলুন। পা টিপে টিপে চলুন। দরজাটাকে ঠেকনোঠাকনা দিয়ে কোনওরকমে বন্ধ করে রেখে পালাই।

আমরা এবার সত্যিই চোরের মতো, এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে এসে জিপে উঠে বসলুম। দাদু কিন্তু দমলেন না। তিনি বললেন, অনীশ, পাখি পালালেও ধরা ঠিক পড়বে। আমার ধারণা ভুল হতে পারে না। হ্যাঁ, ড্রাইভার, খালধারে চলো।

খালের ধারে জিপ থামল। সেই ভাঙা মোটরগাড়ি। দাদু লাফাতে লাফাতে ঢালু বেয়ে নেমে খুঁজে খুঁজে জলের ধার থেকে পরচুলটা তুলে নিয়ে এলেন।

একটু ভিজে গেছে, এই যা। চুলটাকে জিপের সিটে ছড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, গোকুল মিত্তির লেনে চলো।

ভোর হয়ে এসেছে। গোকুল মিত্তির লেনের চায়ের দোকান চালু হয়ে গেছে। থামঅলা হলদে রঙের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। কথার আওয়াজ ভেসে আসছে। জানালায় উকি দিয়ে দেখা গেল যেন আসর বসেছে।

দাদু জানালার কাছ থেকে বললেন, ছেলের কোনও খবর পেলেন?

ভীষণ রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক বললেন, আপনি কে?

আমরা পুলিশ।

আরে আসুন আসুন, অপদার্থ হলেও এককাপ শীতের ভোরের গরম চা খেয়ে যান। আপনারা কিস্যু পারবেন না জেনেই, রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছিলুম। ফলও ফলেছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার ছেলে আসছে। এক সহৃদয় ব্যক্তি নিয়ে আসছেন।

দাদু বললেন, খুব ভাল কথা। আমরা আশেপাশেই আছি। সেই সহৃদয় ব্যক্তিটিকে দয়া করে আমাদের কথা বলবেন না।

আরে না মশাই। আপনারা কি ভগবান, যে জনে জনে বলে বেড়াব, ভগবানের দর্শন পেয়েছি! নিশ্চিন্ত থাকুন।

রক থেকে নেমে দাদু বললেন, অনীশ, তোমার হুইসলটা দাও। তোমরা ওই পাশের গলিতে অপেক্ষা করো। বাঁশি শুনলেই আসবে। শোনো, আমি যা করছি, সবই অনুমানের ওপর নির্ভর করে। না মিললে গালাগাল দেবে না।

পুলিশের গাড়ি পাশের গলিতে চলে গেল। আমরা দু'জনে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম গা-ঢাকা দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কালো ট্যাক্সি

এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। পেছনের আসনে—আরে এ-ই তো সেই টাকমাথা লোকটা। কাল রাতে দেখেছি। লোকটি জানালার কাচ নামিয়ে, বাড়িটা দেখতে দেখতে কর্কশ গলায় বলল, কী, এই বাড়িটা?

দাদুর চোখমুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। গাড়ির শব্দ পেয়েই বাড়ির ভেতর থেকে পিলপিল করে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সব বেরিয়ে এলেন। মেয়েরা কাদছেন আর বলছেন, আহা বাবা এলি! বাবা এলি!

লোকটির কী খাতির, আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। আপনি আমাদের ভগবান। ভাগ্যিস দেখেছিলেন!

অসীমকুমার মৃদু হাসতে হাসতে, আদর খেতে খেতে, নিভাঁজ ভালমানুষের মতো ঘরে গিয়ে বসলেন। আমি আর দাদু সব দেখতেও পাচ্ছি, শুনতেও পাচ্ছি।

দাদু বললেন, বাঁশি আর বাজাব না, তুমি ওদের গলি থেকে ডেকে আনো।

অনীশবাবু আমার ডাক শুনে, দলবল নিয়ে চুপিচুপি চলে এলেন। গাড়িটা গলিতেই রয়ে গেল। দাদু ফিসফিস করে বললেন, আজ এক ঢিলে তিন পাখি মারব।

দাদুই আগে ঘরে ঢুকলেন, কী খবর অসীমকুমার?

এই চলছে একরকম। অ্যা, আপনি আবার কে? হু আর ইউ?

আমি কেউ না বাবা, একজন বুড়ো। এরাই সব। এই যে আমার পেছনে।

দাদুর পেছনে পুলিশবাহিনী। সেইদিকে তাকিয়ে টাকুবাবু বললেন, এ কী, এ আবার কী তামাশা!

তামাশা নয় বাবা। বাচ্চা ছেলেটাকে এই ভীষণ শীতে, সারারাত মালগাড়িতে পুরে রেখে বড় কষ্ট দিয়েছ বাবা। সংসারে টাকার চেয়ে বড় কিছু নেই, তাই না বাবা অসীম! ছেলেটা সারারাত জল জল করেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কিছু খেতে পায়নি।

কী যা-তা বলছেন? আমি সকালে দমদম ইয়ার্ডে একে কুড়িয়ে পেয়ে নামধাম জেনে এখানে নিয়ে এসেছি!

রিওয়ার্ডের লোভে? তা ধরে পুরস্কার ঘোষণা না করলে বাবাজি তোমার যে বড় পণ্ডশ্রম হয়ে যেত। টাকাটা যে অত সহজে আসত না।

কী আবোলতাবোল বকছেন! ওকে আমি ধরতে যাব কেন? এইজন্যে আজকাল আর কেউ পরোপকার করতে চায় না। থাকত পড়ে বেশ হত। খোকা, তোমাকে আমি ধরে মালগাড়িতে ভরে রেখেছিলুম?

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে বললে, না, সে অন্য লোক।

দাদু অনীশবাবুকে বললেন, ওহে অনীশ, একটু চেপে ধরো তো!

ভদ্রলোককে খপ করে চেপে ধরতেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। দাদু অমনি টাকের ওপর পরচুলটা পরিয়ে দিলেন। ছেলেটি বললে, তুমিই তো, তুমিই তো আমাকে ধরেছিলে। পুতুল দিয়েছিলে, চকোলেট দিয়েছিলে, মেরেছিলে, গলায় পেনসিল ঢুকিয়ে দিয়েছিলে।

দাদু বললেন, অনীশ, এই তোমার একনম্বর পাখি। মঞ্চ অভিনেতা, অসীমকুমার।

মেয়েরা বললেন, কী সুন্দর, কী সুন্দর। পাশাপাশিতে কী দারুণ অভিনয়!

দাদু চুলটা তুলে নিয়ে গোপ ধরে মারলেন এক টান। মুখটা একেবারে পালটে গেল।

অনীশ, এই তোমার দ্বিতীয় পাখি, সেই নোটজালের অভিযুক্ত আসামি কালু সর্দার। যে জামিন টপকে পালিয়েছিল। মুখটা মনে পড়ছে?

দাদু এবার ডান গালের আঁচিলে মারলেন এক টান। নিজের চশমাটা চোখ থেকে খুলে বসিয়ে দিলেন চোখে। অনীশ, এই তোমার তৃতীয় পাখি, বম্বের ডিরেক্টার টাবু, যে সারা কলকাতার শ'তিনেক লোককে গত বছর চিট করে হাওয়া হয়েছিল। তোমরা কাগজে ওর ছবি ছেপে লোককে সাবধান করায়, বাবাজীবন ভোল পালটাতে বাধ্য হয়েছিল। নাও, এই মহাপুরুষ এখন তোমাদের সম্পত্তি।

ঘরসুদ্ধ লোক হাঁ। আমরা হাঁ।

সদলে থানায়। সেখানে সেকেন্ড অফিসার বললেন, স্যার, সাংঘাতিক কাণ্ড। কাল রাত এগারোটার পর থেকে কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী কিরণ মুখোপাধ্যায় আর তার নাতি দু'জনেই মিসিং। কিরণবাবুর হাতে নাকি সাংঘাতিক একটা মার্ডার কেস রয়েছে।

অনীশবাবু বললেন, এই নাও দু'জনকেই, গাড়িতে ভরে বাড়ি দিয়ে এসো।

তা হলে, ওঁরা যে ডায়েরি করিয়ে গেলেন—মিসিং, পাশে লিখে রাখি, ফাউন্ড।

অবশ্যই, অবশ্যই।

দাদু, জিপে উঠতে উঠতে বললেন, পাখিটি ঘুঘু জাতীয়, ফাঁদটি ভাল করে পেত। আর এই নাও, এই কাগজটা ডাক্তারখানায় ছিল। একটা চিঠির খসড়া। ছেলেটির বাবা পুরস্কার ঘোষণা না করলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ

দাবি করে এটি ছাড়া হত। আর শোনো, দলে আরও জনা দুই আছে, তার মধ্যে সেই গুগলু মাস্তানটাও আছে মনে হয়। দাওয়াই দিলেই সন্ধান মিলবে!

চারপাশে ঝলমলে রোদ। সকালের কলকাতা। রাত পালিয়েছে। দাদুর সঙ্গে রাতে আর বেরোচ্ছি না কোনওদিন। আমরা বাড়ির দিকে এগোচ্ছি। বারান্দায় সার সার উদ্বিগ্ন মুখ। টুসিটা পাঁচিলে বসে আছে, ইয়া মোটা চামরের মতো এক ন্যাজ বুলিয়ে। কতই যেন লক্ষ্মী মেয়ে!

ক্যালিপসো থ্রম্বোফব

এটা তো জুতোর কালি। কালিতে আপনার এই ছড়ি পালিশ হবে কী করে?

যা বলেছি তাই করো। বড়দের কথা অবিশ্বাস করবে না। অবিশ্বাসী ছেলেকে বলে ডেপো ছেলে।

দাদুর পাঞ্জাবি পরা হয়ে গেছে। চোখে সোনার ফ্রেমের সেই নতুন চশমাটা উঠেছে। পাঞ্জাবির হাতায় মিহি গিলে। আয়নার সামনে দাড়িয়ে পাকা চুলে বুরুশ চালাচ্ছেন। আয়নায় আমাকে দেখছেন আর কথা বলছেন।

তাড়াতাড়ি হাত চালাও। রোদ উঠে গেলে সে বেড়ানোকে আর মর্নিংওয়াক বলা চলে না।

ছড়িটা অনেকদিন পড়ে থেকে থেকে ময়লা ধরে গেছে। আজ ছড়ি না-ই বা নিলেন। দুপুরে পরিষ্কার করে রাখব, কাল থেকে নিয়ে বেরোবেন।

বুরুশ রেখে দাদু ঘুরে দাঁড়ালেন, কাজকে অত ভয় পাও কেন? হাতে ছড়ি থাকলে ইজ্জত বাড়ে, জানো কি তা? ওই আগরওয়ালের পাশে খালি হাতে ঘুরলে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। তোমার দাদুরও একটা প্রেসটিজ আছে।

নেপাল এয়ার লাইন্সের কী একটা মামলা জিতিয়ে দিয়ে দাদুর খুব নামডাক হয়েছে। পুরনো গাড়ি বিদায় করে চাপাফুল রঙের নতুন একটা গাড়ি কিনেছেন। মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁট কি রুমাল দিয়ে দরজার হাতল পালিশ করেন। বনেট চকচকে করে মুখটা চট করে একবার দেখে নেন।

প্রসাদদা স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোরের ঘুম এখনও চোখে লেগে আছে। আমারও মাঝে মাঝে হাই উঠছে। ভোরের এই

ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুমটা যা জমত না! দাদুর এই বেড়ানো যে আর ক'দিন চলবে? পারা যায় না।

ছড়ির ডগা দিয়ে দাদু প্রসাদদার মাথার পিছনে টুক করে মারলেন। চলো হে প্রসাদচন্দ্র। পুব আকাশে লাল রং ধরেছে। আজ এই ব্যাটার জন্যে পনেরো মিনিট লেট হয়ে গেল। গোয়েঙ্কার এতক্ষণে একশো পাক মারা হয়ে গেল!

গোয়েঙ্কা নয় দাদু, আগরওয়াল।

তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো?

একটু আগে আপনিই বললেন আগরওয়াল।

আরে, নামে কী এসে যায়! আসল হল মানুষ। তোমাকে হুলো বললেও যা, গবা বললেও তাই। সেই এক দুর্দান্ত, অশান্ত, ছটফটে ছেলে। প্রসাদ, গাড়ি আজ এত আস্তে চলছে কেন?

আজ্ঞে, ভোরবেলা তো, তাই একটু ঝিম মেরে গেছে। এখনও ভাল করে ঘুম ছাড়েনি।

চা খেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।

তার মানেই, গাড়ি খেয়েছে। এইবার একটু ফুর্তিতে চালাও।

ইডেনের পাশ দিয়ে গাড়ি গঙ্গার ধারে একেবারে ফোর্টের কাছে চলে এল। ভিজে ভিজে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বেশ মোটা মতো একজন ভদ্রলোক ঢালু সবুজ মাঠের ওপর তালে তালে ছুটছেন। ভুড়ি নাচছে। গালের থলথলে মাংস নাচছে। এখানে মোটারা রোগা হতে আসেন।

গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই দাদু নেমে পড়লেন। বেড়াবার জন্যে প্রাণ যেন ছটফট করছে। আমার দাদুর আজকাল খুব সুখ হয়েছে। যত দুঃখ আমার। বছরে চার-পাঁচবার পরীক্ষা দিতে হলে কার আর সুখ থাকে!

ছড়িটাকে বারকয়েক বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে হাওয়া খাইয়ে নিলেন। আন্দামান থেকে ছড়িটা দাদুর এক বন্ধু এনে দিয়েছিলেন। প্যাডক কাঠের তৈরি। প্যাডক আবার কী কাঠ, কে জানে বাবা। দাদু চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, কই, আমার ফ্রেন্ড ঝুনঝুনওয়ালাকে তো দেখছি না আজ?

ঝুনঝুনওয়ালা নয় দাদু, আগরওয়াল।

ওই হল রে বাবা!

লম্বা লম্বা পা ফেলে দাদু হাঁটা শুরু করলেন। এত জোরে হাঁটছেন যে আমাকে ছুটতে হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল টেন্টের দিকে ধাওয়া করেছেন। আরও অনেকে এসেছেন। সকলেরই কাজ জোরে জোরে হাঁটা। চেনা কেউ উলটো দিক থেকে পাক মেরে ফেরার সময় মুখোমুখি হলে শুধু একটু মুচকি হাসা। কথা বলারও সময় নেই। মনে মনে গুনতে হবে পাকের সংখ্যা— এক পাক, দু'পাক...।

প্রথম পাক মেরে ফেরার সময় রোজের অভ্যাসের মতোই দাদু বা দিক ঘেঁষে আসছিলেন। কাটাতারের বেড়া, ঝোপঝাড়। শুরু হয়েছে ফোর্টের নিজস্ব এলাকা। পরিখা রয়েছে জল নেই। জায়গাটা দেখলেই দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। কেবল গাছ আর গাছ।

মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাদু হঠাৎ থমকে পড়লেন, এ কী?

মাটিতে, ঝোপের ধার ঘেঁষে একটা চশমা পড়ে আছে। নতুন চশমা। আমাকে বললেন, তোলো। নিচু হয়ে চশমাটা তুলতে গিয়ে দেখি, ঝোপের মধ্যে

সোনালি আর একটা কী চকচক করছে। ছড়ি দিয়ে টেনে জিনিসটাকে বের করে আনলেন দাদু। ছোট্ট একটা ডায়েরি। চারটে কোণ পেতল দিয়ে মোড়া।

নাও তোলো।

নোটবুকটা দাদুর হাতে দিলুম। হাতে নিয়েই বললেন, ভিজে ভিজে ঠেকছে। সারা রাত এই ঝোপে পড়ে ছিল। শিশির লেগে গেছে।

গরমকালে শিশির পড়ে দাদু?

তক্ক কোরো না। সব কালেই রাতে একটু না একটু শিশির পড়ে। রাতের খবর তুমি কতটুকু রাখো হে খোকা। দশটা বাজতে না বাজতেই ভোঁস ভোঁস ঘুম।

আপনি আজকাল ভীষণ ঝগড়া করেন।

ঝগড়া! তোমার সঙ্গে ঝগড়া! একে ঝগড়া বলে? ঝগড়া কাকে বলে তাই জানিস না। তুই দেখছি গোরুর চেয়ে গাধা।

বাবা! সে আবার কী জিনিস। গোরুর চেয়ে গাধা? গোরু আবার কবে গাধা হল? না বাবা, তক্ক করব না। আবার গালাগাল খেতে হবে।

দাদু বললেন, ব্যাপারটা খুব ফিশি মনে হচ্ছে। আয় নির্জনে কোথাও একটু বসি।

ফিশি মানে কী দাদু? আঁশটে?

তোমাকে এখন ইংরিজি শেখাবার সময় আমার নেই। ফিশ থেকে বিশেষণ করে ফিশি, মাঝে মাঝে ডিকশনারিটা তো ওলটাতে পারো। বাড়িতে তো বইয়ের অভাব নেই।

দূরে একটা গাছতলায় আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসলুম। রোদ ফুটছে ধীরে ধীরে। কী সুন্দর দিন। সামনে ফোর্ট, পরিখা, লম্বা লম্বা ছায়া। অনেক দূরে

খাকি রঙের একটা মিলিটারি ভ্যান চলে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চেপে একজন পুলিশ চলেছে। সাদা প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে তিনজন খেলোয়াড় সমান তালে ছুটছেন।

দাদু নোটবুকটা খুললেন। প্রথম পাতাতেই নাম আর ঠিকানা। বিপুলকিরণ চৌধুরী। আলিপুর রোড। ফোন নম্বর। আরও সব নানারকম নম্বর লেখা। গাড়ির লাইসেন্স নম্বর। ইনশিয়োরেন্সের পলিসি নম্বর। পরের কয়েকটা পাতা সাদা। তারপরে একটা পাতায় লেখা, সত্য আর কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে? আবার সাদা পাতা। তারপর হঠাৎ লেখা, ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। শেষ লেখা, আজ মাঝরাতে যা থাকে বরাতে।

দাদু আমার মুখের দিকে তাকালেন, কী বুঝলে?

ফিশি।

অ্যা, ঠিক বলেছ।

ওই মাঝরাতেই মরেছেন। ডেডবডিটা মনে হয় কাছাকাছি কোথাও আছে। হয়তো ওই পরিখার ভেতরে।

গবেট। কেসটা তোমার মাথায় ঢোকেনি। বিপুলবরণ...

বিপুলকিরণ দাদু।

ওই হল রে বাবা। বিপুলবাবু একজন ধনী মানুষ, তিনি সত্যসাধনকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই সত্য ব্যাটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে হঠাৎ এখানে দেখতে পেয়ে বিপুলবাবু ধরতে ছুটেছিলেন। ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। দুম করে পড়ে গেলেন। চশমা চোখ থেকে ছিটকে চলে গেল। নোটবুক বুকপকেট থেকে পড়ে গেল। সবাই ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেল। এই দুটি জিনিস কারু চোখে পড়ল না। বুঝলে কিছু?

আজ্ঞে না। এই লেখাগুলো কি তা হলে ঘটনা ঘটে যাবার পর? আবার লেখা রয়েছে মাঝরাত। আপনি দাদু একদম ধরতে পারেননি।

ইয়েস, ঠিক বলেছ। আমিই একটি গবেট। তোমার তা হলে কী মনে হয়?

এটা মার্ডার্স কেস। যে-কোনও কারণেই হোক ভদ্রলোক মাঝরাতে এখানে এসেছিলেন, সেই সময় চ্যাক।

চ্যাক, সে আবার কী?

চ্যাক করে ছুরি। ঠিকানা যখন রয়েছে তখন চলুন না ভদ্রলোকের বাড়িতে একবার যাই। জিনিস দুটো ফেরত দেওয়া যাবে। কিছু ঘটে থাকলে জানাও যাবে।

অল রাইট চলো তা হলে।

॥ দুই ॥

বিশাল বাড়ি। কিন্তু কেমন যেন ভূতুড়ে মার্কা। বড় গাছ, ছোট গাছ, সব একসঙ্গে জড়াজড়ি। বাইরে থেকে বাড়িটা কিছু কিছু অংশ চোখে পড়ে। গাড়িবারান্দা তার ওপর লাল টালি-ছাওয়া একটা ছাদ। দোতলার একটি অংশ চোখে পড়ার মতো, যেন হাওয়া-মহল, বাতাসে ঝুলছে। বাড়ির বিশাল গেটটি কিন্তু বন্ধ। বোম্বাই চেহারার তালা ঝুলছে।

দাদু আমার দিকে অদ্ভুত মুখে তাকালেন। জানি, বেশ কড়া কিছু বলবেন। ঠিক তাই। ছড়িটা তালার গায়ে ঠেকিয়ে, শব্দ করে বারকয়েক দুলিয়ে

বললেন,তোমার কথা শুনে কিছু করলেই বড় ভুগতে হয়। সকালের বেড়ানোটা গেল। কমলালেবুর রস খাওয়ার সময় চলে গেল।

কমলালেবুর রস? এখন কমলালেবু পাবেন কোথায়?

সেটা আমার ভাবনা নয়। আমেরিকায় বড় বড় লোকেরা সকালে কমলালেবুর রস খায়। আমিও খাব আজ থেকে। হরিদাসকে আমি বলে এসেছি। মাথাব্যথা তার।

এখন তা হলে আমাদের কী করা উচিত দাদু?

বলো, তোমার হুকুমেই তো চলছি। আচ্ছা, আশেপাশে একটু খোঁজখবর করলে হয় না? কাঠের নেমপ্লেটের নামটা তো ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই তো পড়া যাচ্ছে না।

বাড়িটার পাশে, পাঁচিলের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা ঘর। কোনও কালে এই বাড়িরই আউট-হাউস ছিল। সামনের দিকে দরজা ফুটিয়ে এক ধোবিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তোলা উনুন গনগন করছে। দুটো ইস্ত্রি চাপানো রয়েছে। দড়িতে সার সার ভিজে ভিজে শাড়ি ঝুলছে। গাটাগোট্টা একটি লোক মল্লবীরের মতো ইস্ত্রি করে চলেছে। ভিজে জামা থেকে ইস্ত্রির উত্তাপে বাষ্প উঠছে। হাসা উচিত নয়, তবু হাসি পেয়ে যাচ্ছে, লোকটির মাথায় ইয়া মোটা একটা টিকি, কাজের তালে তালে ডাইনে বায়ে দুলছে। ডগায় আবার কায়দা করে একটা কলকেফুল বাঁধা হয়েছে।

দাদু আমার সামনে দুটো আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, যে-কোনও একটা ধরো।

খপ করে মাঝের আঙুলটা চেপে ধরলুম।

দাদু বললেন, বাংলা।

তার মানে?

বাংলায় প্রশ্ন করব, না হিন্দিতে, ঠিক করতে পারছিলুম না। তাই লটারি করলুম।

লোকটিকে অনেক প্রশ্ন-ট্রশ্ন করে যা জানা গেল, তা অনেকটা গল্পের মতো। বাড়িতে একজন মাত্র মানুষ থাকেন, তার নাম বিপলবাবু! দাদু বললেন, ঠিক আছে, পু আমরাই করে নিচ্ছি উ লাগিয়ে।

তা সেই বিপলবাবু বড় মজার মানুষ। বড় বড় চুল দাড়ি, গোঁফ, যেন তুলসীদাসজি। কখনও প্যান্ট-কোট পরেন, কখনও শেরোয়ানি, কখনও আলখাল্লা। লোকজন বাড়িতে খুব কমই আসে। মাঝে মাঝে খুব লম্বামতো বুড়ো এক সায়েব আসে। খাস বিলিতি সায়েব। খুব পুরনো আমলের একটা মোটর গাড়ি আছে। সেরকম গাড়ি এখনকার কালের রাস্তায় চলে না। দু'পাশে পাদানি, টেপা হর্ন, ইয়া তার চোঙা। শব্দ হয় ভ্যাক, ভ্যাক। কোনও কোনও দিন অনেক রাতে গাড়িটা গেট খুলে রাস্তায় নেমে আসে পাগলের মতো। পেছনে লাল আলোটা এত জোরে জ্বলে, যেন আগুন পড়ছে গলে গলে, টিকিদার তাই মনে হয়।

আমার দাদু, আইনের মানুষ বাবা। তাঁর অন্য কথা মনে হবে আমি জানতুম। দূরে পার্ক-করে রাখা গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন, মানুষ কেন যে আজকাল এত নেশা করে? সব সময় নেশায় টং হয়ে আছে। গাঁজার ধোয়ায় সব লাল দেখছে। গাড়ি লাল, আলো লাল, পৃথিবীটাই লাল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। প্রসাদদা দুটো জিনিস মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পারে, গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া, আর স্টার্ট বন্ধ করা।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, জিনিস দুটো তা হলে কোথায় জমা দেবেন? থানায়?

না, আমার কাছেই থাকবে। সশরীরে যোগাযোগ সম্ভব না হলেও, বিজ্ঞানের যুগে কণ্ঠস্বরে যোগাযোগ তো হতে পারে। সারাদিন টেলিফোনে সেই চেষ্টাই চলবে।

কাপড়-জামা না পালটে দাদু প্রথমেই বসার ঘরে টেলিফোন ডাইরেক্টরি নিয়ে পড়লেন। বইটা খুললেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। খুদে খুদে অক্ষর, লাখ লাখ নাম। পাতা ওলটাচ্ছেন আর বলছেন, যেমন দেশ, তার তেমন ব্যবস্থা।

হরিদাসদা এক গেলাস লেবুর জল আর ছোট্ট একটা রেকাবিতে বড় এক কোয়া রসুন এনে পাশে রাখলেন। এ আবার কী ধরনের খাওয়া? আমেরিকান? মানুষ বড়লোক না হইলে পাগল হয় না। কার উক্তি? আমার। মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না-র নকলে এইমাত্র তৈরি করে ফেললুম, আমার কী প্রতিভা। জুভিনাইল ট্যালেন্ট। আমাদের পাড়ায় সাত বছরের একটি ছেলে সাংঘাতিক তবলা বাজায়, দাদু যখনই তার প্রশংসা করেন, তখনই বলেন ওই ইংরিজিটা।

'জয় বাবা ধন্বন্তরি'-- লেবুর জল দিয়ে রসুনের কোয়াটা কোঁত করে গিলে ফেললেন। দম নিয়ে বললেন, জয় বাবা বাত-হরা, হৃদয়-হরণ বসুনায় নমঃ।

রসুন আর পাতিলেবু একসঙ্গে শরীরের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। ডাইরেক্টরিটাকে রাগের চোটে তছনছ করে, আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। দুম করে সোফায় এসে পড়ল ডানা-ছ্যাতরানো জটায়ুর মতো।

তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো। নবজাতকের দৃষ্টি চাই ওই জরদগব থেকে কিছু পেতে হলে।

সময়টা আমার খুবই ভালই যাচ্ছে বলতে হবে। এক চান্সেই নম্বরটা পেয়ে গেলুম। নাম, ঠিকানা সব মিলে গেছে। দাদু বললেন, নম্বরটা লিখে রাখো। ঘন্টাখানেক পরেই ফোন করা যাবে। তবে ফোন করে লাভটা কী হবে। চশমা আর নোটবুকের মালিককে কি পাওয়া যাবে? তিনি কি আর এ-জগতে আছেন?

দাদু লাইব্রেরি ঘরের দিরে চলে গেলেন। এইবার সব বড় বড় মক্কেলদের আগমন হবে। দাদু চলে যেতেই আমি টেলিফোনটা ভয়ে ভয়ে তুলে নিলুম। নম্বরটা ডায়াল করতেই বাজতে শুরু করল। কেমন যেন গা ছমছম করছে। অজানা জগতে শব্দ ধাক্কা মেরে মেরে কাউকে জাগাতে চাইছে। বলা যায় না তিনি হয়তো মৃত। পুরনো আমলের বড় বড় বাড়িতে, অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

রিসিভার তুলে নিলে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম একটা শব্দ হল। বাজনা থেমে গেল। উত্তেজনায় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কাপা কাপা গলায় বললুম, হ্যালো হ্যালো।

সাড়াশব্দ নেই, তবে রিসিভার যে তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাকের ডাক, ম্যাকাও পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। অদ্ভুত আর একটা আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি, যেন ঝোড়ো বাতাস বইছে সাঁ সাঁ করে। আর একবার হ্যালো বললুম। এবার আমার ভীষণ ভয় করছে। কীসের ভয় তা বলতে পারব না। বহু দূরে নির্জন কোনও বাড়িতে ফোন বাজছে, আমার মনে হচ্ছে একা একা আমি সেই ষড়যন্ত্রের জগতে ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারছি না।

চিৎকার করে ডাকলুম, দাদু!

ছুটে এলেন। সিরিভারটা দিয়ে বললুম, ওই বাড়ি, বেশ রিং করছিল। রিসিভার কেউ তুলেছেন, কিন্তু সাড়া দিচ্ছেন না। শুনুন।

কানে রিসিভার লাগিয়ে দাদু অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ জোরে জোরে বললেন, হ্যালো হ্যালো। তারপর বিরক্ত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ঝড়াং করে।

তোমার যেমন কাণ্ড, কী ডায়াল করতে কী ডায়াল করেছে। ক্রস কানেকশান হয়ে বসে আছে।

রিসিভারটা তুলে নিলেন। খুব রেগে রেগে ট্যাপ করতে লাগলেন। বারবার নামালেন, ওঠালেন। জিরো ডায়াল করলেন, নাইন নাইন ঘোরালেন। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ফোনটাকে কী করে দিলে তুমি? কার মধ্যে দিয়ে কী ঘুরিয়ে দিলে?

যেমন ঘোরায় সেইভাবেই ঘুরিয়েছি দাদু। অন্য কোনওভাবে ঘোরাইনি। একটাই তো চাকা। চাকার মধ্যে তো আর চাকা নেই!

দেখো চেষ্টা করে যদি জট ছাড়াতে পারো। একই সঙ্গে পাখি ডাকছে, তার মানে লাইনের একটা মাথা গিয়ে ঢুকেছে চিড়িয়াখানায়, আর একটা মাথা মনে হয় কারু ফুসফুসে ঢুকেছে, যেরকম সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে।

দাদু নিজের কাজে চলে গেলেন। আমার পড়া আছে। চশমা আর একটা নোটবুক নিয়ে মাথা খারাপ করলে পরীক্ষার ফলও খারাপ হবে। চশমা আর নোটবুক টেবিলের ওপর পড়ে রইল।

মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলে দেখা হতে লাগল, যদি ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে। কোথায় কী! সেই এক পাখির ডাক, আর সাঁ-সাঁ বাতাসের শব্দ। সারাদিনে ফোন আর ঠিক হল না। বিকেলের দিকে দাদু বললেন, আমার কর্তব্যজ্ঞান কী বলছে জানো হুলো, জিনিসদুটো নিয়ে অবিলম্বে আলিপুর থানায় গিয়ে অভয়চরণকে সব বলা। ব্যাপারটা খুব...

আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিশি মনে হচ্ছে।

ভেরি গুড। মনে রেখেছ তা হলে গেট রেডি। চলো তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক।

প্রসাদদার এখন দুটো কাজ। হয় গাড়ি মোছা, আর না হয় গাড়ি চালানো। কথায় কথায় আফশেস করেন, ব্যাক গিয়ারটা এখনও তেমন সড়গড় হল না।

থানার সামনে বিশাল ভিড়। দাদু প্রসাদদাকে বললেন, গাড়িটা একটু দূরে দাড় করাও গণবিক্ষোভ চলছে। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে!

দাদুর বন্ধু অফিসার-ইন-চার্জ অভয়চরণকে একদল ঘিরে ফেলেছেন। জনতা চেল্লাছে, তিনিও চেল্লাচ্ছেন, তারস্বরে বলছেন, আচ্ছা মুশকিল, এর আমি কী করতে পারি?

জনতা বলছে, নিশ্চয় পারেন, আলবাত পারেন, আপনার হাতে আইন আছে।

দাদু দু'বার কাশলেন। সেই বিখ্যাত কাশি, যা শুনে এজলাসে জজসাহেবও তটস্থ হন। এ কাশি, কাশির কাশি নয়, দৃষ্টি আকর্ষণের শব্দ। জনতা চুপ হয়ে গেল।

দাদু বললেন, অভয়চরণ, ব্যাপারটা কী। একেবারে মেছোহাটা বসিয়ে ফেলেছ!

এই যে স্যার আপনি এসে গেছেন? নমস্কার, নমস্কার! অভয়বাবু দাদুকে নমস্কার করতেই, জনতাও নমস্কার ঢুকে দিল।

দাদু এবার জনতার উদ্দেশে বললেন, কী হয়েছে? সমস্যা কী?

জনতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সকলে একসঙ্গে, অভয়বাবু হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে এক পিকিউলিয়ার কেস। মানুষের মাথা বটে। এক

বাড়িওলা ভাড়াটে উচ্ছেদের জন্য করেছে কী, বিশ-বাইশটা লেড়ি কুকুর এনে পাশের ঘরে পুরে দরজায় তালা মেরে দিয়ে সরে পড়েছে। এইবার সেই বিশটা কুকুর বিশরকম সুরে অষ্টপ্রহর ডেকে চলেছে। এরা বলছেন, ভাড়াটে বেচারা তো পাগল হয়েইছে, সেই সঙ্গে সারা পাড়া পাগল হতে চলেছে। এ সমস্যার আমি কী করতে পারি। ভদ্রলোক বেআইনি তো কিছু করেননি। কুকুর পোষার কনস্টিটিউশানাল রাইট সকলেরই আছে।

শোনো শোনো অভয়চরণ, সংবিধান অধিকার যেমন দিয়েছেন, তেমনি অধিকারের অপব্যবহার সম্বন্ধেও সাজার ব্যবস্থা রেখেছেন। ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য কুকুর পোষা নয়, মানুষকে উত্ত্যক্ত করা। তুমি পাঁচ-আইনে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসো। তারপর আমি ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দোব।

জনতা চিৎকার করে উঠল, যুগ যুগ জিয়ো।

এক কথায় থানা সাফ। অভয়বাবু সেকেন্ড অফিসারকে বললেন, একটা হুলিয়া বের করে লোকটাকে পাকড়াও করে আনো, আর তালা ভেঙে...

দাদু বললেন, না, না, তালা ভেঙো না, ওইটাই তো প্রমাণ।

ঝামেলা মিটে গেল। দাদু এবার নিজের কেস পাড়লেন, অভয়চরণ ব্যাপারটা বড় মিস্টিরিয়াস। এই চশমা আর নোটবুকটা আজ সকালে আমি ফোর্টের পাশ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। নোটবুকের ঠিকানা দেখে সকালে আমরা দু'জনে আলিপুর রোডে গিয়েছিলুম, বুঝলে। বিশাল বাড়ি। ফটকে তালা ঝুলছে। পাশেই এক ধোবির ডেরা। সে আমাকে গল্প শোনাল, তাতে মনে হচ্ছে বাড়িটাও খুব মিস্টিরিয়াস। ইতিমধ্যে আমরা ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সেও এক রহস্যময় ব্যাপার। ফোন বাজল। কেউ একজন রিসিভারও তুলল, ব্যস, সব

খতম। সেই থেকে আমাদের ফোনে কেবল পাখির ডাক আর সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে। তুমি একবার চলো অভয়চরণ।

আপনি মুকুজ্যেমশাই একটা না একটা ব্যাপারে বেশ জড়িয়ে পড়েন, তারপর কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।

আহা আমার কী অপরাধ বলো। সকালে ফোর্টের ধারে বেড়াতে গিয়ে যদি পেয়ে থাকি, কী করে চোখ বুজিয়ে চলে আসি।

দাঁড়ান, এখুনি যাব। টক করে এক চুমুক চা মেরে নি!

বেশ বড়সড় কাপে তিন কাপ চা, আর গরম গরম শিঙাড়া এল। বেশ ভালই জমল। বাড়িতে আমি চা খাই না। এখন আমি দাদুর অ্যাসিস্টেন্ট মানে সমানে সমানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দলবল তৈরি হয়ে গেল। অভয়বাবু আমাদের গাড়িতেই উঠলেন। আগে চলেছে জিপ, পেছনে আমাদের গাড়ি।

বাড়ির সামনে এসে আমরা নেমে পড়লুম। সেই একই তালা ঝুলছে। ধোবি বললে, সে কাউকে ঢুকতেও দেখেনি, বেরোতেও দেখেনি।

অভয়বাবু বললেন, আপনি বলছেন ফোন রিং করেছিল, রিসিভার কেউ তুলেছিস, কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর রিসিভারাও আর ঠিকভাবে নামিয়ে রাখেনি, যার ফলে আপনার ফোনে পাখি ডাকছে। তার মানে ব্যাপারটা খুব...।

আমি বললুম, ফিশি।

ঠিক বলেছ, ভীষণ ফিশি। তা হলে তালা ভেঙে ঢুকতে হয়।

দাদু বললেন, অবশ্য। রহস্যপুরীর ভেতরে কী হচ্ছ, আমাদের দেখতে হবে। দিনকাল আর আগের মতো নেই।

পুলিশের হাতে তালা। এক চাড়ে খোল-নলচে সমেত ছিটকে বেরিয়ে এল। চাকা লাগানো বিশাল গেট ঠেলতেই হাট হয়ে খুলে গেল। সামনেই একটা

মার্বেল পাথরের স্ট্যাচু। একজন মহিলা ডিসকাস ছোড়ার জন্য চিরপ্রস্তুত। বিশাল বিশাল গাছ কলকাতার অপরাহ্ণের আকাশ মাথায় করে রেখেছে। অজস্র পাখি ডাকছে, আর ডাকছে সেই ম্যাকাও।

অভয়বাবু বললেন, ব্যাপারটা কী!

ভৌতিক, স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার, বাড়ি আছে, জনপ্রাণী নেই।, দাদু উত্তর দিলেন।

অভয়বাবু বললেন, নিজেকে ঠিক চোরের মতো মনে হচ্ছে। এখুনি দুম করে পেছন থেকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কে? কাকে চাই? হাত ফসকে পুলিশের এই ব্যাটনটা পড়ে যাবে।

দাদু বললেন, ঠিক বলেছ, আমরা কীরকম চোরের মতো পা টিপে টিপে হাঁটছি দেখেছ।

নীচের তলা, ভোঁ ভোঁ। আর একটি মাত্র ঘর দেখতে বাকি। নীচের সব ঘরই বেশ সাজানো গোছানো, বড়সড়। এই ঘরটি সবচেয়ে বড়। আর একমাত্র এই ঘরেরই দরজায় একটা পরদা ঝুলছে। অভয়বাবু পরদা সরাতেই আমরা চমকে উঠলুম। দরজার দিকে পেছন করে আরাম কেদারায় বসে আছেন বিশাল এক পুরুষ। এক মাথা ধবধবে সাদা চুল।

কোনও উত্তর নেই। এমনকী মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন না পর্যন্ত। অভয়বাবু তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, মে আই কাম ইন স্যার?

উত্তর নেই। দাদু বললেন, হি ইজ ডেড। মার্ডার। আর হবে না, এত বড় বাড়িতে কোনও মানুষ বেশিক্ষণ থাকতে পারে? ভয়েই মারা যাবে।

আমরা চুপিচুপি ঘরে ঢুকলুম। অভয়বাবু বললেন, ঘুমিয়ে পড়তেও পারেন।

সামনে গিয়ে আমরা বিস্ময়ে হা হয়ে গেলাম। মানুষ নয়, মানুষের মূর্তি। অভয়বাবু বললেন, অসাধারণ, কে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে বলুন তো। একেবারে ভড়কে দিয়েছে!

নিশ্চয়ই কোনও ইতালীয় শিল্পী।

আঃ, একটা হাতের কাজ বটে। অভয়বাবু মূর্তিটার মাথায় একবার হাত বোলালেন।

দাদু বললেন, টেলিফোনটা তা হলে কোথায়, কোন ঘরে আছে?

এত বড় একটা বাড়ি, একটাও লোক নেই কেন আমার মাথায় আসছে না। আমারও খুব ফিশি মনে হচ্ছে। দোতলার আয়োজন আরও বিশাল। চওড়া, টানা, চিক ফেলা বারান্দা। শেষ মাথায়, মোটা মোটা গরাদ বসানো খাঁচায় বিশাল দুটো ম্যাকাও পাখি খ্যা, খ্যা করে ডাকছে, আর মাঝে মাঝে লোহার গরাদে টিনকাটা কঁচির মতো ঠোঁট ঠুকছে। ঘরের ভেতর ঘর, তার ভেতর ঘর। এমনি বেশ সাজানো গোছানো, তবে দীর্ঘকাল ঝাড়ামোছা হয়নি। পাতলা ধুলোর স্তর জমে আছে মেঝেতে, ফার্নিচারে।

একেবারে শেষের ঘরে এসে আমাদের অনুসন্ধান শেষ হল। নীল কাচ ঘেরা নীল একটি ঘর। সমস্ত আসবাবপত্র সাদা। বড় অদ্ভুত দৃশ্য। ছোট্ট একটি সাদা টেবিলের ওপর সাদা প্রিয়দর্শিনী ফোন। সাদা বেতের চেয়ারে অসাধারণ সুন্দর একজন মানুষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। রিসিভার-ধরা ডান হাতটি টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মাথাটা সামনে ঝুলে আছে। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লে যেমন হয় আর কী।

অভয়বাবু বললেন, বাঃ, এ মূর্তিটার কী সুন্দর ভঙ্গি দেখুন। এটাও মনে হয় কোনও ইতালীয় শিল্পীর তৈরি।

দাদু বললেন, তোমার মুন্ডু। এটা মূর্তি নয়, মানুষ! অ্যান্ড হি ইজ ডেড। মনে হয় এরই নাম বিপুলবরণ।

বিপুলকিরণ দাদু!

আরে বাবা বরণ আর কিরণ এক জিনিস। ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলে। টেলিফোনটা তুলে হ্যালো বলার আগেই স্ট্রোক।

অভয়বাবু বললেন, এ পোস্ট মর্টেম না হলে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না।

তুমি বলছ মার্ডার?

হতে পারে। আচ্ছা, মেঝেতে এত চুন-বালি পড়ে আছে কেন। মনে হচ্ছে সিলিং থেকে খুলে পড়েছে। বাড়িটা পুরনো ঠিকই, কিন্তু ভেঙে পড়ার অবস্থা তো হয়নি।

দাদু সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র আবিষ্কার করলেন। রক্তমুখী নীলার মতো বাইরের আলো সেই ছিদ্রপথে নেমে আসছে। শুধু ওই ছেদা নয়, খানিকটা অংশ কেউ যেন ধারালো কিছু অস্ত্র দিয়ে কেটে দিয়েছে।

অভয়বাবু ব্যাটন তুলে উত্তেজিত হয়ে যেই দেখাতে গেলেন, ওই দেখুন...', কথা শেষ হল না। টানটান তার হঠাৎ ছিড়ে পড়ে গেলে যেরকম শব্দ হয়, চিন করে সেইরকম একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটনের মাথাটা কেটে দুটুকরো হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল।

আরে ব্বাস, এ কী ব্যাপার? অভয়বাবু ভয়ে মাথা নিচু করে মেঝেতে বসে পড়লেন?

দাদু বললেন, কী আশ্চর্য! ভৌতিক ব্যাপার।

পুলিশ হয়ে ভূতে বিশ্বাস করি কেমন করে। দাঁড়ান, আর একবার পরীক্ষা করি। যে জায়গার দাঁড়িয়ে যেভাবে ব্যাটনটা দুলিয়েছিলুম সেইভাবে আর একবার একটা কিছু দোলাই। ওই ল্যাম্পস্ট্যান্ডটা।

অভয়বাবু ল্যাম্প স্ট্যান্ডটা ধীরে ধীরে ওপরদিকে তুলতে লাগলেন। উত্তেজনায় আমাদের নিশ্বাস পড়ছে না। হঠাৎ একটা জায়গা বরাবর স্ট্যান্ডের মাথাটা আসতেই চিন করে সেইরকম একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেটে উড়ে গেল। কেউ যেন ধারালো অস্ত্রে কোপ মেরে দিলে।

অভয়বাবু মেঝেতে বসে পড়ে বললেন, কী বুঝছেন? ওই জোনে মানুষের মাথা পড়লে উড়ে যাবে।

দাদু গোল হয়ে চারপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিলেন। চোখদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। বুঝলে অভয়, এ ঘরে খুব বেশি নড়াচড়া না করাই ভাল। যে যেখানে আছি, সেইখানে দাঁড়িয়েই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

দাদু, আমি একটা কথা বলব?

এই দুর্দিনে তুমি আবার অশান্তি করবে?

অশান্তি নয়। আমি একটা জিনিস লক্ষ করছি, রিসিভারের যে মুখটা কানে দেওয়া হয়, সেই মুখটা টেবিলের ওপর এখন যেভাবে যেমন পড়ে আছে, সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কোনাকুনি একটা জ্যা টানলে, সেই জ্যা ছাদের যে অংশ স্পর্শ করে, সেই অংশটি ফুটাে হয়ে খুলে পড়েছে। চোখে দেখে আমার যা মনে হল, আপনাকে বললুম।

দাদু আর অভয়বাবু একসঙ্গে বললেন, বাবা, কী সাংঘাতিক জ্যামিতি। তার মানে? তুমি কী বোঝাতে চাইছ?

আজ্ঞে, ওই যে কাল্পনিক রেখাটির কথা আপনাদের বললাম, ওই রেখার লাইনে কোনও কিছু এলেই দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে। যেমন ল্যাম্পস্ট্যান্ডের মাথাটা। বিশ্বাস না হয় আবার পরীক্ষা করে দেখুন।

দাদু বললেন, বলো কী! তোমার মাথা তো বেশ খুলে গেছে!

অভয়বাবু বললেন, বেশ, আর একবার পরীক্ষা করা যাক।

ল্যাম্পস্ট্যান্ডের বাকি অংশটা হিসেবমতো তুলতেই চিন করে আবার সেই শব্দ, খানিকটা অংশ ঠিকরে চলে গেল। আনন্দে আমি হাততালি দিয়ে উঠলুম। আমার ধারণাই ঠিক।

অভয়বাবু বললেন, উঃ, তুমি ঠিক ধরেছ তো! আচ্ছা, কেন এমন হচ্ছে বলতে পারো?

আজ্ঞে যতদূর মনে হয়, বিজ্ঞানের গল্প পড়ে যা জেনেছি, ওই রিসিভারের কানের অংশটি মারাত্মক, ওর মধ্যে এমন কোনও কল আছে, যা সুপারসনিক শব্দ তরঙ্গ ছাড়ছে, যে তরঙ্গের ক্ষমতা অসীম। স্পেনে, এক্সম্যান বলে এক খুনি, ওই শব্দতরঙ্গ দিয়ে অনেক খুন করেছিল। নাইট অব দি বেলথাবাব বইয়ে পড়েছি। বিশ্বাস না হয় রিসিভারের মুখে একটা কিছু চাপা দিয়ে দেখুন।

অভয়বাবু নিচু হয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে উঠলেন। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে একটা মোটা বই পাশ থেকে সাবধানে ইয়ারপিসের ওপর ফেলতেই সুই-সাত করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে বই ফুটো। শুধু ফুটো নয়, দপ করে আগুন ধরে গেল।

দাদু বললেন, এ ক্লিয়ার কেস অব মার্ডার। ব্যাপারটা কী বুঝতে পেরেছ অভয়। রিসিভারটি তুলে কানের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারড্রাম ছ্যাদা করে ব্রেনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। মৃত্যুর কারণ— কনকাশনস অব দি ব্রেন।

সে তো বুঝলুম, কেসটা কিন্তু ভীষণ কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল। দেখলেন তো সেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোল।

তুমি সবার আগে ওই বিপজ্জনক রিসিভারটিকে উলটে রাখো।

আজ্ঞে ও আমার কম্মো নয়। এক্সপার্ট আনাতে হবে।

তা হলে শব্দ যে অ্যাকসিস ধরে যাচ্ছে সেইটা খেয়াল রেখে ঘরটা একটু অনুসন্ধান করলে কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। অন্তত আমার তাই ধারণা।

আচ্ছা আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে মুকুজ্যেমশাই, মৃত ভদ্রলোকই কি বিপুলকিরণ, কারণ চোখে কোনও চশমা নেই!

আরে, চশমা তো আমার পকেটে। চোখে থাকবে কী করে!

চশমা যাঁরা দীর্ঘদিন পরেন তাদের নাকের ওপর একটু দাগ থাকে। কই চশমাটা দেখি।

দাদু চশমাটা পুলিশ অফিসারের হাতে দিলেন। চশমাটা ভাল করে দেখলেন। চোখের সামনে তুলে ধরে, একবার কাছে এনে, দূরে সরিয়ে বললেন, মাইনাস পাওয়ার এবং বেশ ভালই পাওয়ার। যার চশমা, তিনি মায়োপিক। চশমা ছাড়া পৃথিবী তার কাছে ধূসর। চশমা ছাড়া এক মুহূর্তও চলার কথা নয়। তা ছাড়া ওই মুখের চশমা হতেই পারে না। কত বড় দেখেছেন?

দাদু বললেন, ইনি তা হলে কে?

অভয়বাবু বললেন, দেয়ালে দুটো ছবি ঝুলছে দেখেছেন? তার মধ্যে একজনের চোখে চশমা এবং এই চশমা। তার মানে, উনিই হলেন সেই নিরুদ্দিষ্ট বিপুলকিরণ। ছবিটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন।

দাদু বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। ইনি তা হলে কে?

দাঁড়ান, ওই ধোবিটাকে ডাকা যাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোবি এসে গেল। রুটি পাকাচ্ছিল। হাতময় আটা লেগে আছে। ঘরে ঢুকে লোকটি আড়ষ্ট হয়ে গেল। অভয়বাবু বললেন, এই বাবুকে চেনো, উহু কাছে যেয়ো না, মরবে। দূর থেকে দেখে বলো।

লোকটি বললে, এ বাবু, বিপুলবাবুর লেড়কা। কভি কভি আসেন, কভি কভি বাহার চলে যান। আওর কুছ হামি জানে না বাবু সাচ বাত।

আচ্ছা, তুমি যাও।

ধোবি সেলাম করে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম, মুখবন্ধ একটা চিঠি। চিঠিটা পোস্ট করা হয়নি। ঠিকানা লেখা হয়েছে, ডাকটিকিটও সাঁটা হয়েছে। যাঁকে উদ্দেশ করে লেখা তার নাম মিসেস রোজমেরি চৌধুরী, জসলোক হসপিটাল।

দাদু বললেন, অভয় চিঠিটা খোলা যাক।

চিঠিটা খোলা হল। বাংলাতেই লেখা, মা, তোমার কথামতো বাবার তদারকি করতে এসে আমার খুব খারাপ লাগছে, বেশ ভয়ও করছে। বাবার এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। অর্থাভাব, শরীরও ভাল যাচ্ছে না। চারপাশে পাওনাদার। তার ওপর ম্যালকম নামক এক সায়েবের পাল্লায় পড়েছেন। দু'জনে কীসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে। আমার মনে হয় ওই সায়েবই বাবাকে শেষ করে দেবেন। আমার আশঙ্কা যে কতদূর সত্য কালই তার প্রমাণ পেলাম। মাঝরাতে বাবা আর ম্যালকম সায়েব নীচের লাইব্রেরি ঘরে, যেখানে আমার ঠাকুরদার পিতার স্ট্যাচু আছে সেই ঘরে ঢুকলেন। আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম। ওঁদের দু'জনকে অনুসরণ করার ইচ্ছা আমার আর হল না। সায়েব আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। বাবাকেও আজকাল কেমন

যেন অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয়। আমি ভাবলাম লাইব্রেরি ঘরে ওঁরা হয়তো গভীর রাতে পড়াশোনা করবেন। ওঁরা একটা কিছু খুঁজছেন, সেটুকু আমি বুঝেছি। সারাদিন বইপত্তর ঘাঁটছেন, পরিবারের পুরনো রেকর্ড নাড়াচাড়া করছেন। একদিন ওঁদের একটা কথা ওভারহিয়ার করেছিলুম, সেভেনথ স্টেপ, আন্ডারগ্রাউন্ড। কী তার মানে, বুঝিনি। বোঝার চেষ্টাও করিনি। এখন মনে হচ্ছে উদাস হয়ে ভুলই করেছি। আজ এই দুপুর পর্যন্ত দু'জনেরই পাত্তা নেই, অথচ গ্যারেজে গাড়িটা রয়েছে। এখন আমার কী করা উচিত। পুলিশে যেতে সাহস হচ্ছে না একটি মাত্র কারণে, সে কারণ তুমি জানো। আমার মনে হয় তোমার একবার আসা উচিত। ইতি, সহস্রকিরণ।

দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, অভয়, লাইব্রেরি, সব রহস্য ওই ঘরে। দু'জনে ঢুকেছে কিন্তু বেরোয়নি। কী থাকতে পারে ও-ঘরে? এমন কিছু, যা দু'জনে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এই ম্যালকম লোকটাই বা কে?

আবার আমরা লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকলুম। বাতাসে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ। কাগজ পোড়া। চুরুট। কীসের গন্ধ। এ গন্ধ তো একটু আগে ছিল না।

দাদু বললেন, অভয় একটা গন্ধ পাচ্ছ?

পাচ্ছি মুকুজ্যেমশাই। আগে ছিল না।

আচ্ছা, সেভেনথ স্টেপ, আন্ডারগ্রাউন্ড মানেটা কী?

মাটির তলায় সপ্তম ধাপ!

কোন মাটি? এই ঘরের মাটি? আচ্ছা এই স্ট্যাচুটা কি আমরা ভাল করে দেখেছি। বুড়ো, মাটিতে শুয়ে পড়ে কান পাতো।

শুয়ে পড়ে কান পাততেই বহু দূর থেকে ভেসে আসা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলুম। সেই রকমই মনে হল যেন। দাদুকে বললুম। সকলেই একবার করে শুনলেন। অভয়বাবু বললেন, বাসুকির নিশ্বাস।

দাদু বললেন, ইঞ্চি ইঞ্চি করে মেঝেটা পরীক্ষা করা দরকার। এই ঘর। এই ঘরেই ওরা এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছে যা মূল্যবান।

আবার আমার আবিষ্কার। চেয়ারে বসে থাকা পাথরের মূর্তির তলায় একপাশে তেলের মতো কী যেন পড়ে আছে। সহজে চোখে পড়ার কথা নয়। খুব খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল। দাদু আর অভয়বাবু দু'জনেই পরীক্ষা করলেন, ঠিক বলেছ তুমি, তেলই। তেল কেন এল?

অভয়বাবু চেয়ারের হাতল ধরে বা দিয়ে টানতেই মূর্তিটা একটু যেন ঘুরে গেল।

মুকুজ্যেমশাই, এটা যেন ঘুরতে চাইছে।

তাই নাকি? এসো তা হলে, মারো টান, ঘোরাও, ঘোরাও।

দু'জনের টানে পুরো একশো আশি ডিগ্রি সহজেই ঘুরে গেল। মূর্তির মুখ হয়ে গেল দরজার দিকে। গোল একটা গর্ত। অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সামান্য পোড়া পোড়া গন্ধ। ক্ষীণ একটা গোঙানির শব্দ। পাতালের অন্ধকার থেকে কে যেন অস্পষ্ট স্বরে বলছেন একটু জল, একটু জল।

টর্চের আলো পড়তেই দেখা গেল, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের দিকে। অভয়বাবু আপনমনে বললেন সেভেনথ স্টেপ আন্ডারগ্রাউন্ড।

দাদু বললেন মনে রেখো, সেভেনথ স্টেপ মানে সপ্তম ধাপ।

আমরা তা হলে নামতে থাকি মুকুজ্যেমশাই?

অবশ্য, অবশ্য। প্রতিটি মূহুর্ত এখন মূল্যবান।

এক ধাপ, দু'ধাপ, ধাপগুলো বেশ উঁচু উঁচু। পোড়া পোড়া গন্ধটা বেশ প্রবল হচ্ছে ক্রমশ। পঞ্চম ধাপ। আমরা বেশ নীচে নেমে এসেছি। গরম একটা বাতাস আসছে। ষষ্ঠ ধাপে অভয়বাবু থেমে পড়লেন। পেছনে দাদু, তার পেছনে আমি। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, কী হল অভয়?

সপ্তম ধাপটা নেই মুকুজ্যেমশাই। ভেঙে ফেলেছে। এখন আমাদের জয় মা বলে লাফাতে হবে। পারবেন আপনি?

খুব পারব। মারো লাফ। খুব সাবধান। কীসের ওপর লাফাচ্ছ একবার দেখে নাও। তলিয়ে যেয়ো না যেন!

অভয়বাবু একটা পুলিশি লাফ মারলেন। অন্ধকারে কোথায় গিয়ে পড়লেন বোঝা গেল না। টর্চের আলো দুলে উঠল। পরপর আমরা দু'জনে লাফিয়ে পড়লুম। অদ্ভুত সুন্দর এক সুড়ঙ্গ। সামনে চলে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে। সোজা হয়ে দাড়ানোও চলে। ছাদটা যদিও মাথার খুব কাছে দুরে একটা আগুন ফুলকি কেটে কেটে সামনে আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

দশ-বারো পা এগোতেই গোঙানির শব্দটা আরও স্পষ্ট হল। একজন মানুষ কাত হয়ে পড়ে আছেন। মুখ বাধা। হাত-পা পিছমোড়া। দাদু বললেন, আরে! এই তো বিপুলকিরণ।

অভয়বাবু হঠাৎ আতঙ্কের গলায় বললেন, সর্বনাশ, এ কী করেছে। কুইক, কুইক আগুনটা কোথায় কীভাবে এগিয়ে আসছে দেখেছেন। এখুনি ঝাড়বংশ শেষ হয়ে যাব।

মুখখোলা একটা পেট্রলের টিন, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে দড়ির পলতে। আর মাত্র হাত-পাঁচেক দূরে আগুন দড়ি বেয়ে সাপের মতো খেলতে

খেলতে এগিয়ে আসছে। অভয়বাবু ছোঁ মেরে দড়িটা টিন থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ছুটে গিয়ে পা দিয়ে চেপে চেপে আগুনটা নিবিয়ে দিলেন।

দাদু বললেন, মারার কল বেশ ভালই তৈরি করে রেখে গেছে। কার কাজ বলো তো?

অভয়বাবু বিপুলকিরণের মুখের বাঁধন খুলতে খুলতে বললেন, ইনিই বলতে পারবেন।

বিপুলবাবু বললেন, একটু জল।

দাদু বললেন, জল পরে, আগে বলুন ব্যাপারটা কী?

ম্যালকম, ম্যালকম আমার সর্বনাশ করে চলে গেছে।

কোথায় গেছে।

ওই সপ্তম ধাপের তলায় ছিল বহুমূল্য সোনার জগদ্ধাত্রী। কেউ জানত না। আমরা দু'জনে সারা রাত ধরে খুঁড়ে বের করার পর আমচকা আমাকে আক্রমণ করে। আমার এই অবস্থা করে, সুড়ঙ্গ ধরে সোজা চলে গেছে সামনের দিকে।

কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই সুড়ঙ্গ?

একেবারে ফোর্টের ধারে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।

বাবা সে তো দীর্ঘপথ। কতক্ষণ আগে গেছে?

খেয়াল নেই। এখন দিন কি রাত আমার জানা নেই।

আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন?

একটু জল।

আমার পকেটে কিছু লজেন্স ছিল। দুটো বের করে বিপুলবাবুর হাতে দিলুম। মোড়ক খুলে অভয়বাবু বললেন, চুষতে চুষতে চলুন। আর ভাববার সময় নেই।

আমরা চারজনে প্রায় দৌড়োতে শুরু করলুম। কী মজা! মাথার ওপর কলকাতা, আমরা তলা দিয়ে ছুটছি। উলটো দিক থেকে ড্যাম্প বাতাস আসছে। সোদা সোদা গন্ধ। মাঝে মাঝে হিসহিস শব্দ আসছে। মনে হয় সাপ। জায়গায় জায়গায় মাথার ওপর গাছের শিকড় ঝুলে পড়েছে হিলহিলে সাপের মতো।

বিপুলবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আর আমরা ওকে ধরতে পারব না। বড় সাংঘাতিক ক্যারেক্টর। বন্ধুর ছদ্মবেশে এসেছিল ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার।

দাদু ছুটতে ছুটতে বললেন, তবু চেষ্টা ও হ্যাঁ, এই নিন, আপনার চশমা আর নোটবুক। এই দুটোর জোরেই প্রাণে বাঁচলেন।

এইবার মনে হচ্ছে কোথাও একটু বসতে পারলে হত। আলিপুর থেকে ফোর্ট, কম দুর। অভয়বাবু হাতের টর্চ সামনের দিকে অন্ধকারের বুক চিরে চলে গেছে। এতক্ষণ আলোকে অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছিল। হঠাৎ আলো কীসে যেন ঠিকরে ফিরে এল। অন্ধকার ঝলমল ঝলমল করে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, জ্যোতি জ্যোতি।

বিপুলবাবু প্রায় চিৎকার করে বললেন, আমার সোনার জগদ্ধাত্রী, সোনার জগদ্ধাত্রী।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে লম্বা চেহারার এক সায়েব চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় সম্পূর্ণ অসহায়। বিপুলবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, স্কাউন্ডেল ম্যালকম।

ম্যালকমের হাতদুটো চোখের সামনে তোলাই ছিল, অভয়বাবু কড়াক কড়াক করে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। ম্যালকম ক্ষীণ স্বরে বললে, কে, পুলিশ?

অভয়বাবু ব্যাঙ্গের সুরে বললেন, কেন, দেখতে পাচ্ছ না মানিক।

ম্যালকম করুণ সুরে বললে, দেখতে পেলে, আমাকে কি আর এখানে দেখতে পেতে! ওই মূর্তি আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। শুধু অন্ধ নয়, আমার পা দুটোও অসাড় হয়ে গেছে। বিলিভ ইট অর নট।

আমরা এখন তা হলে কোন দিকে যাব মুকুজ্যেমশাই। শুরুর দিকে, না শেষের দিকে? অভয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

দাদু বললেন, শুরুর দিকে। যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকেই যেতে হবে। বিপুলবাবু হয়তো দুঃখ পাবেন, তবু সত্যকে তো আর চেপে রাখা যাবে না। আপনার ছেলে সহস্রকিরণ খুন হয়েছে।

আমি ভেবেছিলুম খবরটা শুনেই বিপুলবাবু উলটে পড়ে যাবেন। না, খুব সামলে নিলেন। সামান্য একটু মুখের শব্দ করে বললেন, আমাদের কিন্তু শেষ থেকেই শুরু করতে হবে।

তার মানে?

আমরা মূর্তিটা নিয়ে ফোর্টের দিকে যাব। ওখানে আমার গাড়িটা এই ব্যাটা সায়েব পার্ক করে রেখে এসেছে। গাড়িটাকে নিয়ে আসা দরকার। গাড়িটার এখন অনেক দাম। ওল্ড মডেল।

তা মূর্তিটা নিয়ে যাবার কী দরকার? ওটা এখানেই থাক না। অভয়বাবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন।

বিপুলবাবু বললেন, এই অভিশপ্ত সুড়ঙ্গে আর ঢুকতে চাই না। তা ছাড়া, আমরা এখন পোর্টের খুব কাছাকাছি। দেখছেন না, গঙ্গার বাতাস আসছে। আমরা গাড়ি চেপে ফিরে আসব।

অভয়বাবু বললেন, ফিরে আসব কেন? সোজা থানা চলে যাব। মূর্তিটাকে সরকারি খাতায় জমা করে দিতে হবে।

বিপুলবাবু বললেন, সে আবার কী কথা! আমার মূর্তি সরকারি খাতায় চলে যাবে? এ যে দেখছি হবু রাজার আইন।

বিপুলবাবু, এটা এখন আর মূর্তি নয়। সলিড গোল্ড। সরকারি আইনকানুন বড় জটিল। তা ছাড়া আপনিই যে বিপুলকিরণ তার কোনও প্রমাণ নেই।

দাদুব ললেন, অভয়, পয়েন্টটা তুমি ভালই তুলেছ হে। ধোবি যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে তো মিলছে না। বিপুলবাবু, আপনার র‍্যাশান কার্ড আছে?

র‍্যাশানের চাল, র‍্যাশান কার্ড এসব আমার স্ট্যাটাসের অনেক নীচে। আমার কাছে খুব ইনসাল্টিং মনে হয়।

তা বললে চলে? র‍্যাশান কার্ড ছাড়া প্রমাণ করবেন কী করে, আপনি কলকাতার নাগরিক। তা ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে আপনার চেহারা একদম মিলছে না।

প্রত্যক্ষদর্শী আবার কে?

আপনারই ভাড়াটে ধোবি।

কী বর্ণনা দিয়েছে? বড় বড় চুল, দাড়ি-গোঁফ, যেন তুলসীদাসজি। কখনও প্যান্ট-কোট পরেন, কখনও শেরোয়ানি।

ঠিকই বলেছে। কালই আমি দাড়ি-গোফ কামিয়ে ফেলেছি, এই এক্সপিডিশনের জন্যে।

অভয়বাবু বললেন, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ কী? মূর্তি আপনার না সরকারের, আইন ঠিক করে দেবে। আমরা পুলিশ, আইনের কী বুঝি বলুন? আর আপনি যদি বিপুলকিরণ সত্যিই হন, এক মিনিটে প্রমাণ করে দিতে পারবেন। গাড়ির লাইসেন্স আছে। ব্যাঙ্কের পাসবই আছে। নিন চলুন। এগিয়ে চলুন।

বিপুলবাবু পকেট থেকে একটা বড় তোয়ালে বের করে মূর্তিটায় জড়িয়ে দিলেন। তারপর বেশ কসরত করে তুলে নিলেন কোলে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভারী। এতক্ষণ কেউ ভেবে দেখেনি, ম্যালকমসায়েব কী করে হাঁটবে। চোখ অন্ধ। পায়ে পক্ষাঘাত।

শলাপরামর্শ করে ঠিক হল, হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ম্যালকম যেমন আছে ওই ভাবেই থাকবে। একটা স্ট্রেচার এনে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে চ্যাংদোলা করে।

অভয়বাবু বললেন, ফরোয়ার্ডম মার্চ।

শব্দটার মধ্যে কী আছে, কে জানে। সকলেই আমরা এগোতে লাগলুম সৈনিকের মতো। পাঁচ মিনিটও হাঁটা হয়নি, সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল। সামনেই দশ ধাপ সিঁড়ি। মাথার ওপর গোলাকার আকাশ। ভীষণ অবাক লাগছে। অত বড় একটা গোলমুখ, বাইরের কারু নজর পড়ে না কেন? অনবরতই তো লোক চলাচল করছে। কেউ কি একবার ভাবেও না গর্তটা কীসের। আচমকা কেউ পড়ে যেতেও তো পারে?

সব প্রশ্নের জবাব পেলুম ওপরে এসে। গর্তের মুখটা মনে হয় কালও চাপা ছিল। গোল একটা ঘাসের চাবড়া উলটে পড়ে আছে একপাশে। লোহার ঢাকনার ওপর কার্পেটের মতো ঘাস গজিয়েছে। অষ্টদশ শতকের সুড়ঙ্গমুখ বিংশ শতকে খোলা হল। আমরা প্রিন্স অব ওয়েলসের মেমোরিয়ালের কাছে উঠে এসেছি। সামনেই দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বিশাল বিশাল পিলার। জায়গাটা বেশ নির্জন নির্জন। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দূরে দূরে গাড়ি ছুটছে। ফাঁকায় এসে দম ছেড়ে বাঁচলুম। একপাশে সেই বিদঘুটে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ধোবির বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। গাড়িটার পেছন দিকে অনেক পাইপ বেরিয়ে আছে। পুরনো গাড়িতে এত পাইপ থাকত নাকি?

ফিসফিস করে দাদুকে প্রশ্ন করলুম। দাদু একটু বিরক্ত হলেন, তুমি আর জ্বালিয়ো না বাপু!

ঠিক আছে জ্বালাব না। তবে গাড়ির চেহারাটা বড় সন্দেহজনক।

বিপুলবাবু মুর্তিটাকে ড্রাইভারের পাশের আসনে সাবধানে বসালেন। তোয়ালের মোড়কে ফুট-দুয়েক উচ্চতার একটি আকৃতি।

অভয়বাবু বললেন, আমরা তা হলে পেছনে উঠে বসি।

বিপুলবাবু বললেন, দাঁড়ান, আগে দেখি, স্টার্ট নেয় কি না। তা না হলে হাতল মারতে হবে। মাঝে মাঝে ঠেলতেও হয়।

বিপুলবাবু দরজা খুলে চালকের আসনে বসলেন। দরজা বন্ধ করে পায়ের কাছে কোনও একটা কিছুতে চাপ দিলেন। ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। আওয়াজটা কানে লাগল। নতুন ধরনের আওয়াজ। পেছনের পাইপ দিয়ে নীল এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। সব ক'টা পাইপের মুখে আগুন জ্বলছে। এক-এক রকম রং। নীল, লাল, চাপাফুল।

অভয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী সব ঠিক আছে তো?

বিপুলবাবু বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

আমরা তা হলে উঠি।

হ্যাঁ উঠে পড়ুন।

অভয়বাবু দরজার দিকে হাত বাড়ালেন, ঠিক পেছনেই দাদু, পাশে আমি। নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বিদ্যুৎবেগে গাড়িটা গঙ্গার দিকে ছুটে গেল। অভয়বাবু বাতাসের ঝাপটায় উলটে পড়ে গেলেন। মনে হল একটা রকেট উড়ে চলে গেল। পেছন দিকে আগুন গলে গলে পড়ছে। সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল অট্টহাসি। 'গুডবাই, গুডবাই মিস্টার চিপস।

আমি আর অভয়বাবু দু'জনেই দৌড়োতে লাগলুম। ব্যর্থ চেষ্টা। গাড়ি ম্যান অব ওয়ার জেটির ওপর দিয়ে সোজা জলে নেমে তীব্র বেগে ডায়মন্ডহারবারের দিকে ছুটে গেল।

অভয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন, এটা কী হল?

আজ্ঞে, গাড়িটা অ্যাম্ফিবিয়াস।

সে আবার কী ?

উভচর। স্থলেও চলে, জলেও চলে। জেট ইঞ্জিন লাগানো।

ইডিয়ট।

কে, আমি ?

তুমি না, তুমি, আমি।

আমি পেছনে অতগুলো পাইপ দেখে দাদুকে বলেছিলুম, দাদু বললেন, আর জ্বালাসনি।

লোকটা কে বলো তো?

ওর নাম মনে হয়, ক্যালিপসো-গ্রম্বোফব।

সে আবার কে?

আজ্ঞে, বইয়ে পড়েছি, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অপরাধী।

দূর, সে হল গল্প।

গল্পই তো সত্যি হল।

তা ঠিক।

দাদু এসে গেছেন। কী, ভেগেছে তো?

হ্যাঁ, কলা দেখিয়েছে। আচ্ছা, চশমাটা ঠিক আপনি কোন জায়গায় পেয়েছিলেন?

চলো দেখাচ্ছি।

যেখান থেকে আমরা চশমা আর নোটবই পেয়েছিলুম সেই জায়গাটায় এলুম। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ফোর্টের পরিখা। দু'জন মিলিটারি অফিসার গল্ফ স্টিক উঁচিয়ে, অনেকটা নীচে ঝোপের মধ্যে কিছু একটা দেখাচ্ছেন উত্তেজিত হয়ে। কিছু দূরে একটা শকুন বসে আছে।

অভয়বাবুকে দেখে একজন চিৎকার করে বললেন, অফসার, হিয়ার লাইজ এ ডেডম্যান।

অভয়বাবু তার বিশুদ্ধ ইংরিজিতে উত্তর দিলেন, হাউ টু গো দেয়ার, হিয়ার ইজ কাঁটাতারের বেড়া।

দাদু বললেন, ইস, ইস, ইংরজি বাংলায় জগাখিচুড়ি করছ, বলো বার্বড ওয়্যার ফেনসিং।

মুকুজ্যেমশাই, আমার আর মাথার ঠিক নেই, মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

আর্মি অফিসাররা স্টিক নাচিয়ে বললেন, কাম দ্যাট ওয়ে।

কামিং, কামিং, উইথ মাই ফোর্স।

দাদু বললেন, এখন আমাদের সেই আলিপুর অবদি হাঁটতে হবে নাকি?

হাঁটতে হবে কেন। এখনও পুলিশের সে খাতির আছে। হাত তুললে যে-কোনও গাড়ি থেমে যাবে।

তার আগে চলো আমরাই একবার ডেডবডিটা দেখে আসি। পোর্টের প্ল্যাসি-গেট দিয়ে ঢুকে পড়ি। আমার ভীষণ কৌতুহল হচ্ছে।

কৌতুহলের কী আছে? ময়দানে অমন ডেডবডি হামেশাই পড়ে থাকে। আর একটা কেস বাড়ল?

আজ্ঞে না, এর সঙ্গে ওই চশমার যোগ আছে।

ফোর্টের পথ ঢালু হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। দু'জন অশ্বারোহী সৈনিক দুলকি চালে চলেছে। স্পটে পৌছোতে প্রায় মিনিট-দশেক সময় লাগল। বাবা, কলকাতার তলায় এ যেন আর এক কলকাতা।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাদা লংকোট-পরা একজন মানুষ যেন ঘুমে অচেতন। লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি। দাদু বললেন, এই দেখো, আসল বিপুলকিরণ এখানে পড়ে আছে চিরনিদ্রায়। ব্যাপারটা কী বলো তো, মার্ডার।

তাই তো মনে হচ্ছে। পুরোটাই ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপার। দেখলেন তো, তখনই বলেছিলুম, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

তাই তো জগতের নিয়ম রে বাবা। বিপুলকিরণকে ওই দুটো ঠগ কালই শেষ করেছে। অসাবধানে চশমাটা ফেলে রাখায় সব গোলমাল হয়ে গেল। পালের গোদাই পালাল জেট গাড়িতে চেপে। ফাঁদে পড়ে গেল সায়েব।

আমি এখন কিছু মন্তব্য করব না। ফাস্ট ইনভেস্টিগেশান, দেন রিপোর্ট।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই। আইন ইজ আইন। তবে আমার অনুমানের কথা তোমাকে বললাম।

অভয়বাবু অফিসারদের বললেন, আপনাদের ওয়ারলেসটা একটু ব্যবহার করতে চাই। উই হ্যাজ আনআরসড এ টানেল, নিয়ার টু ইয়োর ফোর্ট। ডেডবডি হিয়ার, ডেডবডি দেয়ার, ডেডবডি এভরিহোয়ার।

দাদু বললেল, আঃ অভয়, তোমার ইংরিজিটা তেমন সুবিধের নয়। কাজ করো, কাজ করো।

আর্মি অফিসাররা গল্ফ স্টিক নাচাতে নাচাতে এগিয়ে চললেন, আমরা পেছনে। বেতার প্রেরক যন্ত্রের বিশাল টাওয়ার আকাশের দিকে উঠে গেছে। এক ধরনের সুঁই সুঁই আওয়াজ হচ্ছে। ঘরে বসে আছেন কানে হেডফোন লাগিয়ে এক জওয়ান।

অভয়বাবু বললেন, সমস্ত পোর্টকে অ্যালার্ট করে দিন, ক্লস্ট্রোফোবিয়া উভয়জানে চেপে ভাগছে। ক্যাচ হিম। ক্যাচ হিম।

আমি বললুম, ক্লস্ট্রোফোবিয়া নয়, ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।

জওয়ান ভদ্রলোক তিনবার হ্যালো হ্যালো করে বলতে লাগলেন, নট, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স...।

দাদু আমার ধরে বললেন, চলো, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হর। বাকি কাজটা অভয় একাই করে নিতে পারবে।

যেতে যেতে শুনলুম বাতাসে উড়ে যাচ্ছে সতর্কবাণী, পোর্ট ক্যানিং, পোর্ট হার্বার, অ্যালার্ট, অ্যালার্ট, ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।

উদাস গলায় দাদু বললেন, কে জানে মান্তান ফান্তান হবে।

আমি জানি, আমার মনে পড়েছে, ক্যালিপসো একটা রের্ডপ্লেয়ারের নাম, থ্রম্বোফব একটা একটা মলম।

হিহি। কী মজা।